ম্যানগ্রোভ ২০২৪

স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ

মোংলা, বাগেরহাট

কলেজ বার্ষিকী

ম্যানগ্রোভ ২০২৪

মোংলা সরকারি কলেজ

স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ

মোংলা, বাগেরহাট

মোংলা সরকারি কলেজ বার্ষিকী

প্রকাশকাল

৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি.

সম্পাদনা পরিষদ

প্রদীপ অধিকারী, প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
বিশ্বজিৎ মণ্ডল, প্রভাষক, গণিত বিভাগ
মনোজকান্তি বিশ্বাস, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
এস এম মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

প্রকাশনা

মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

প্রফেসর কে. এম. রব্বানী

আলোকচিত্র গ্রহণে

এস এম মাহবুবুর রহমান

অক্ষরবিন্যাস ও অলংকরণ

মোঃ হাফিজুর রহমান

মুদ্রণ

রবি প্রিন্টিং প্রেস
শান্তিধাম মোড়, খুলনা।
ফোন : ০২-৪৪১১০৬৯৪, ০১৭১১-২৯৫০৮৭
e-mail : rabipressbd@gmail.com

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

অধ্যক্ষ
মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

শুভেচ্ছা বাণী

দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ মোংলা সরকারি কলেজের বার্ষিকী 'ম্যানগ্রোভ'-এর ১ম সংখ্যা ২০২৪ সালে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের বর্ণিল অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যবোধ, জীবনবোধ লিপিবদ্ধ করে রাখার মানসে এ প্রকাশনা। এখনকার এই বোধগুলো পরের প্রজন্মের চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনের পথরেখা অনুধাবন করতে পারবে। আজকের শিক্ষার্থীসমাজ সকল ক্ষেত্রে আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। তাদের কিশোরকালীন ভাবনাগুলো পরিণত বয়সে পড়ার সুযোগ পাবে। শিক্ষকদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনাও এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে একটি কলেজ ম্যাগাজিন বস্তুতপক্ষে দুই প্রজন্মের জীবনবোধের এক বুদ্ধিবৃত্তিক লিপিভাণ্ডার।

আজকের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ভাবনাগুলো রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে বিবেচনায় নিয়ে আগামীদিনের কারিকুলাম-সহ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। একই সাথে ২০৩১ সালের মধ্যে SDG অর্জনে আজকের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরাই প্রধান ভূমিকা রাখবে। জ্ঞানজগতে কলেজ বার্ষিকীর ভূমিকা অপরিসীম। অন্যান্য লেখার পাশাপাশি এখানে স্থানীয় প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র নিয়ে অভিজ্ঞতাজাত কিছু লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এই হিসেবে লেখাগুলো অনেকটা মৌলিকত্বের দাবি রাখে।

কলেজ বার্ষিকীর প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মননশীলতা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশাকরি, এই প্রকাশনা নিয়মিত হবে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর কে এম রব্বানী)

সম্পাদকীয়

সংস্কৃতি সাময়িকভাবে বাধার মুখে পড়লেও সংস্কৃতি অবিনাশী। সমাজের বিকাশ সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সংস্কৃতির এই অবিনাশীতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাহিত্য পত্রিকা মূলত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মননশীল প্রতিভা বিকাশ এবং সাহিত্যচর্চার আদর্শ প্লাটফর্ম।

তারই ধারাবাহিকতায় মোংলা সরকারি কলেজের প্রথম বার্ষিকী "ম্যানগ্রোভ" ১ম সংখ্যা-২০২৪ প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৮১ সালের ১৮ই মে মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ ৪৩ বছরের পথপরিক্রমায় কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালে কলেজটি জাতীয়করণ হলে প্রফেসর কে এম রব্বানী ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি কলেজের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রমকে জোরদারকরণে শিক্ষার্থীদের জন্য ডিবেটিং ক্লাব, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করেন এবং সাথে সাথে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে মোংলা সরকারি কলেজের ১ম কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

পৃথিবীর ১১৮টি দেশে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ বর্গ কিলোমিটারজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গজুড়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার মোহনায় গড়ে ওঠা সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।নাসার স্যাটেলাইট ডাটার তথ্যমতে, ম্যানগ্রোভ বনকে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্বন পরিশোধক। জাতিসংঘের তথ্যমতে, পৃথিবীর ১৭% কার্বন নিঃসরণের ক্ষতি কমিয়ে দিতে সাহায্য করছে ম্যানগ্রোভ বন। ম্যানগ্রোভ দেহকোষ গহ্বরে লবণ সংগ্রহ করে রাখে। বৈরী পরিবেশে অভিযোজন সক্ষমতা এবং ম্যানগ্রোভ মূলত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভূমি বা প্লাটফর্ম, ক্যানভাস। যেটা ম্যাগাজিন অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা হয়েছে ।

সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর এর উপকণ্ঠে অবস্থিত মোংলা সরকারি কলেজ। কলেজের সৃজনশীল সাহিত্য মুখপাত্র 'ম্যানগ্রোভ' শব্দটি উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমসাময়িক ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটেছে 'ম্যানগ্রোভ' সাহিত্য পত্রিকায়।

নামকরণ থেকে শুরু করে মান্যবর অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী মহোদয়ের সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি আলোর মুখ দেখতে পেল। সম্পাদনা পর্ষদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ পত্রিকা প্রকাশের কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলেজ সৃষ্টিলগ্নের আলোকচিত্র দিয়ে সহযোগিতা করায় কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাসকে। যাদের লেখা প্রকাশ পেয়েছে এবং যাদের লেখা জায়গা সংকুলানের অভাবে প্রকাশিত হয়নি উভয়কে অভিনন্দন। যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রতিবছর যাতে এ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় তার জন্য কলেজ প্রশাসনের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

সম্পাদনা পরিষদ
"ম্যানগ্রোভ"
প্রদীপ অধিকারী, প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
বিশ্বজিৎ মণ্ডল, প্রভাষক, গণিত বিভাগ
মনোজকান্তি বিশ্বাস, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
এস এম মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

সূচিপত্র

- সংক্ষিপ্ত কলেজ পরিচিতি ৭
- গৌরবের অগ্রযাত্রায় বিয়াল্লিশ বছর | শেখ আনোয়ার হোসেন ৯
- মোংলা সরকারি কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | ড. অসিত কুমার বসু ১২
- কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (CPD) | নন্দ কিশোর পাল ২২
- বাংলা ভাষা ও আমাদের মর্যাদা | পাপিয়া হালদার ২৩
- বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন | প্রদীপ অধিকারী ২৪
- বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা | ড. অপর্ণা অধিকারী ২৭
- Conservation of Biodiversity: Perspective Bangladesh | Professor K.M. Rabbani ৩০
- স্বর্ণালী স্মৃতিতে ভরা প্রিয় কলেজ | এস. এম. মাহবুবুর রহমান ৩৯
- নতুন শিক্ষাক্রম ও মানসম্মত শিক্ষক | শ্যামা প্রসাদ সেন ৪২
- আশ্রয় | মমতাজ খানম ৪৭
- নারী বিপ্লবী ও প্রীতিলতা | প্রমীলা রায় ৫০
- শিক্ষা নৈতিক চেতনা না কি জীবিকা | নিগার সুলতানা সুমী ৫৪
- সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ | মনোজকান্তি বিশ্বাস ৫৬
- মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে মানুষই পারবে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে | সাহারা বেগম ৬৬
- রবীন্দ্রনাথঃ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা | রূপা দাস ৭১
- "ফানুস" | পলাশ চক্রবর্তী ৭৩
- বাল্যবিবাহ | রঞ্জিতা মন্ডল ৭৪
- জীবন মানেই ডেবিট ক্রেডিট | দেবদাস বাড়ই ৭৬
- মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম | আ.ই.শ.ম বাকী বিল্লাহ ৭৭
- অন্যরকম বন্ধুত্ব | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন ৮২
- জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন | বীনা বিশ্বাস ৮৪
- ব্যবধান | স্বস্তি দীপা চক্রবর্তী ৮৬
- শতবর্ষী চাঁদপাই মেলা | মোঃ ইব্রাহিম খলিল ৮৭
- (১) জীবন 'জীবনে কোনো অনুশোচনা নেই, কেবল পাঠ।' জেনিফার অ্যানিস্টন,
  (২) 'প্রতিদিন আমাদের এমনভাবে কাটানো উচিত, যেনো আজ জীবনের শেষ দিন। সেনেকা,
  (৩) Life is a beautiful flower, we should feel it's Fragrance!,
  নৌশিন আহমেদ রোদেলা | তামিমা হাই ৮৯
- Be Imperfect | Tabassum Jannat Turana ৯১
- সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য | শেফালী মণ্ডল ৯৪
- ব্যর্থতার অপর নাম সফলতা | অহনা বৃষ্টি কথা ৯৭
- আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ | স্বর্ণা খানম ৯৮
- প্রবাহমান সময় এবং সংগ্রামী জীবন একসূত্রে গাঁথা | মরিয়ম মমতাজ বিনতে আনোয়ার ১০২

কবিতা

- প্রাণের ডাক | মনোজকান্তি বিশ্বাস ১০৩
- ধ্যানবান মানুষ | আ.ই.শ.ম. বাকী বিল্লাহ ১০৪
- মাতৃবন্দনা | সুদেব মুখার্জী ১০৫
- বিদ্রোহী নজরুল | সুমাইয়া আফরিন ১০৬
- আমার মাতৃভূমি | অহনা বৃষ্টি কথা ১০৬
- বিজয়ের দিন | অচেনা পাড় ১০৭
- এসো মোংলার কথা বলি | খাদিজা আক্তার পিকু ১০৮
- **কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ** ১০৯
- **কলেজের কর্মচারীবৃন্দ** ১১২
- **কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র** ১১৩

সংক্ষিপ্ত কলেজ পরিচিতি

কলেজের নাম	:	মোংলা সরকারি কলেজ
প্রতিষ্ঠাকালীন নাম	:	মোংলা কলেজ
প্রতিষ্ঠা	:	১৮/০৫/১৯৮১খ্রি.
জাতীয়করণ	:	৩০/০৩/২০১৬ খ্রি.
কলেজের EIIN	:	১১৫০২১
ডিগ্রি কোড	:	০১১০
এইচ এস সি কেন্দ্র কোড-মোংলা	:	৩৯
কলেজ ই-মেইল	:	collegemongla@yahoo.com.
কলেজ ওয়েবসাইট	:	https://Monglagovtcollege.edu.bd
যশোর বোর্ডের কোড নং	:	৪৪৭৬
কলেজ ইনডেক্স নম্বর	:	৫৯০৬০২৩২০১
বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	২৪০০ এর কাছাকাছি।
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৮২ খ্রি.
স্নাতক (পাস) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৯২খ্রিঃ
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/২০১১খ্রি.
বাগেরহাট জেলায় শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি	:	২০০৪সাল।
প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ	:	সুনীল কুমার বিশ্বাস।

❖ অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি. থেকে ২৬/১১/২০০৪ খ্রি.

২। মোঃ গোলাম সরোয়ার ০১/০৭/২০১০ খ্রি. থেকে ২৯/০৩/২০১৬ খ্রি.

৩। অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ২৩/০২/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.

৪। অধ্যাপক কে এম রব্বানী ২৯ /১০/২০২৩ খ্রি. থেকে বর্তমান

❖ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। তৈয়াবুর র□হমান গাজী ২৭/১১/২০০৪ থেকে ০৯/০৫/২০০৮ খ্রি.

২। সুশীল কুমার সরকার ১০/০৫/২০০৮ থেকে ৩০/০৬/২০১০ খ্রি.

৩। মোঃ গোলাম সরোয়ার অফিসার ইন চার্জ ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি. থেকে ০৪/০৩/২০২২ খ্রি.

৪। কুবের চন্দ্র মন্ডল ০৫/০৩/২০২২ খ্রি. থেকে ২২/০২/২০২৩ খ্রি.

৫। মল্লিক অহিদুজ্জামান ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি.

৬। শেখ আনোয়ার হোসেন ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি. থেকে ২৮/১০/ ২০২৩ খ্রি.

গৌরবের অগ্রযাত্রায় বিয়াল্লিশ বছর

শেখ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

দক্ষিণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ মোংলা সরকারি কলেজ। আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বন্দর মোংলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ বিদ্যাপীঠ অত্র এলাকার মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মিটিয়ে আলোকিত মানুষ গড়ার এক মহান ব্রত পালন করে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা এ জনপদবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে এ বিদ্যাপীঠ আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। মোংলার প্রথম উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মোংলা সরকারি কলেজ পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে একটি সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

❖ অতীতে ফিরে দেখা :

মোংলা সরকারি কলেজের পথচলা ইতোমধ্যে বিয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখান থেকে পাস করে শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসায় গবেষণারত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী এবং উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা যারা অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনে কিছু গুণী মানুষের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকে। মোংলা কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। যাঁর হাত ধরে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় এবং যিনি অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সকলের শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাস। তিনি তখন রামপালের গিলাতলা কলেজের প্রভাষক। এক সময় তিনি উপলব্ধি করেন শিক্ষাক্ষেত্রে রামপাল থেকে মোংলা অনেক পিছিয়ে। এখানকার দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে তাদের সন্তানদের দূরে শহরে রেখে লেখা-পড়া করানো অত্যন্ত কঠিন। পিছিয়ে পড়া মোংলার মানুষের জন্য কিছু করা উচিত। মোংলায় ফিরে তিনি সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে বন্ধুদের সাথে নিয়মিত বৈকালিক বৈঠকে উপস্থিত হন। সেন্ট পলস চত্বরের প্রতিদিনের এ বৈঠকে মোংলার শিক্ষা জগতের কিছু গুণী মানুষ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। মোংলা পোর্ট পৌর সভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মরহুম মোঃ আব্দুল বাতেন, সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফ্রান্সিস সুদান হালদার, প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক নীরোদ বিহারী পোদ্দার, এবং একই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অম্বিকা চরণ বিশ্বাস এবং শশধর মল্লিক প্রমূখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বৈঠকে তারা মোংলার শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা

করতেন। এ রকম এক বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে মোংলায় উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মোংলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এ প্রস্তাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে উপস্থিত সবাই তাতে একবাক্যে সম্মতি প্রদান করেন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে বসে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মোংলার জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষানুরাগী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ মোংলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাসের উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর এখান থেকে শুরু হয় কলেজ প্রতিষ্ঠার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম। মোংলার প্রেক্ষাপটে সময় এবং বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কাজটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু কাজ যতই কঠিন হোক কঠোর অধ্যবসায় আর দৃঢ় প্রত্যয় এক সময় সফলতা এনে দেয়। অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে মোংলা কলেজ অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৮ই মে প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে।

শুরুতে মোংলার শেলাবুনিয়ায় একটি মাছের ডিপোকে কলেজের অফিস এবং চালনা বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিকালের শিফটে শ্রেণি পাঠদানের কার্যক্রম শুরু হয়। এরই সাথে মোংলা কলেজের জন্য একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ ব্যাপারে মোংলা পোর্ট পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং উল্লিখিত ব্যক্তিগণ জোরালো ভূমিকা পালন করেন। মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় এ এলাকার শ্রমিক, কৃষক, গরীব, ধনী সর্বস্তরের মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা শ্রম, অর্থ, জমি এবং পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আর এ সকল মানুষের নানামুখী সহযোগিতাকে সমন্বিত করে যিনি বৃহত্তর মোংলার মানুষের কল্যাণে এই অসাধ্য সাধনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করে কাজটি সম্পন্ন করেন, তিনি হলেন মোংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বাবু সুনীল কুমার বিশ্বাস।

কাঠ ও গোলপাতার ঘর তৈরি করে কলেজের মূল ক্যাম্পাসের যাত্রা শুরু হয়। এর পর ধীরে ধীরে কাঠ ও টিনের তৈরি শ্রেণিকক্ষ, দ্বিতল প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি তৈরি করা হয়। বর্তমানে মোংলা সরকারি কলেজ একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর একটি চারতলা ভবন, একটি তিনতলা ভবন এবং তিনটি দুইতলা ভবন রয়েছে যেখানে শ্রেণি পাঠদানসহ প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যক্রম যথানিয়মে পরিচালিত হয়।

১৯৮১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাসের দক্ষ পরিচালনায় ধাপে ধাপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রথমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কলেজে ডিগ্রি কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সময় জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক বাগেরহাট-৩, রামপাল মোংলা থেকে মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মোংলা কলেজে ডিগ্রি কোর্স চালুর করার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁর সহযোগিতায় ১৯৯২ সালে মোংলা কলেজে ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞান এ দুটি বিষয়ে অনার্স কোর্সও চালু করা হয়। মানসম্মত শিক্ষা, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত

ফলাফল অর্জন তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। অবশেষে মোংলা কলেজকে একটি সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে এই গুণী মানুষটি ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর কলেজের সহকারী অধ্যাপক গাজী তৈয়েবুর রহমান এবং সুশীল কুমার সরকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মোঃ গোলাম সরোয়ার। তাঁর সময়ে কলেজে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনার্স কোর্স চালু ও মোংলা কলেজ জাতীয়করণ।

❖ মোংলা কলেজ জাতীয়করণ :

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০১৪ সালে কলেজটি জাতীয়করণের কাজ শুরু হয়। জাতীয়করণে ভূমিকা রাখেন তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম হাবিবুন নাহার এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন একান্ত সচিব মোংলার কৃতি সন্তান ড. নমিতা হালদার।

❖ কলেজের বর্তমান চিত্র :

মোংলা সরকারি কলেজ বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান । উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রি ও স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ পাঠদান করেন। কোর্সভিত্তিক প্রতিটি স্তরে পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। মোংলা সরকারি কলেজে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টরে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রী কমনরুম, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য রয়েছে বৃহৎ মিলনায়তন। বৃহত্তর পরিসরে কথা বলা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে সাউন্ডসিস্টেম। প্রায় ছয় একর জমির উপর বর্গাকার এবং চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত একটি ক্যাম্পাস, যেটি অসংখ্য বৃক্ষের ছায়ায় ঢাকা। ভবনসমূহের সামনে রয়েছে আকর্ষণীয় ফুলের বাগান। কলেজ ক্যাম্পাসের একদিকে রয়েছে খেলার মাঠ আর অন্যদিকে রয়েছে বৃহৎ স্বচ্ছ মিষ্টিপানির পুকুর। এক কথায় চমৎকার সুন্দর পরিবেশ। কলেজ চলাকালীন ক্যাম্পাসে যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সেজন্য শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি যার কথা না বললে নয়, তিনি হলেন প্রফেসর কে এম রব্বানী স্যার, বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়। একজন অত্যন্ত দক্ষতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ মানুষ। বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরে স্যারের রয়েছে ব্যাপক দক্ষতা। এ কলেজে যোগদানের অল্পসময়ের মধ্যে কলেজের ওয়েবসাইট খোলাসহ আইসিটি সেক্টরকে ঢেলে সাজিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত চমৎকার একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মোংলা সরকারি কলেজ।

মোংলা সরকারি কলেজ তার লক্ষ্যপূরণে স্ব-মহিমায় এগিয়ে যাবে সব বাধা অতিক্রম করে এটিই সবার প্রত্যাশা।

মোংলা সরকারি কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. অসিত কুমার বসু
প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ ও
সম্পাদক, মোংলা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের উপকূলীয় জনপদ মোংলা। এখানে ১৯৫০ সালে ১লা ডিসেম্বর গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর । বর্তমান বাগেরহাট জেলার এই জনপদটি পূর্বের রামপাল থানার অন্তর্গত ছিল। সমুদ্র বন্দরকে গুরুত্ব দিয়ে মোংলাকে থানা ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় মোংলা পোর্ট পৌরসভা। এই পৌরসভার শুরু থেকে যিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি হলেন শিক্ষানুরাগী জনাব আব্দুল বাতেন। এখানে পূর্ব থেকেই সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুল রয়েছে। স্কুলের পাশেই রয়েছে শেলাবুনিয়া ক্যাথলিক মিশন। যে মিশনের দায়িত্বে ছিলেন ইটালিয়ান মিঃ রেভারেন্ড ফাদার মারিনো রিগন এস, এক্স। তিনি এই স্কুলে প্রথম প্রধান শিক্ষক এবং পরবর্তীতে যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই জনপদে বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজ করার স্থানীয় জনসাধারণের দাবি থাকলেও ক্যাথলিক মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই বিদ্যালয়টিকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে উৎসাহ দেখাননি। মোংলায় অন্য কোথাও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক এটা কিন্ত তাঁরা মনে প্রাণেই চেয়েছেন। তখন মোংলার আর এক আলোকিত শিক্ষানুরাগী মিঃ সুনীল কুমার বিশ্বাস রামপাল থানাধীন গিলাতলা আবুল কালাম আজাদ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি রামপাল থেকে প্রায়ই মোংলায় আসতেন এবং ছয়/সাত জন সুশীল সমাজের বন্ধু মিলে সেন্ট পলস্ স্কুলের শিক্ষক মিলনায়তনে প্রায়ই আড্ডা দিতেন। তখন আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। এই ভাবে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনের তৎকালীন মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের নেতৃত্বে সাত জন সুশীল সমাজের বন্ধু মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মোংলায় একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। নিম্নে মোংলায় কলেজ প্রতিষ্ঠার সেই সাতজনের অঙ্গীকার পত্র তুলে ধরা হলো:-

অঙ্গীকার পত্র

১০/০৯/১৯৮০ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে সমবেত হইয়া এলাকার উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নকল্পে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম।

১। জনাব আব্দুল বাতেন
২। মিঃ সুনীল কুমার বিশ্বাস
৩। মিঃ ফ্রান্সিস সুদান হালদার
৪। মিঃ নীরোদ বিহারী পোদ্দার
৫। জনাব ডাঃ সৈয়দ নাজিম আলী
৬। মিঃ অম্বিকাচরণ বিশ্বাস
৭। মিঃ শশধর মল্লিক

পরবর্তীতে প্রস্তাবিত মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে ২৪/১০/১৯৮০ খ্রি. তারিখ শুক্রবার বিকাল পাঁচ ঘটিকায় মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২৩/১১/১৯৮০ খ্রি. তারিখ অত্র এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণের এক সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভা আহ্বানের জন্য অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস ও জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

২৩/১১/১৯৮০ খ্রি. তারিখে সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ ফ্রান্সিস সুদান হালদারের ব্যবস্থাপনায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল দশ টায় মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস ও মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের নেতৃত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত এলাকার বর্ষীয়ান বিদ্যোৎসাহী জনাব আলহাজ্ব ইমান আলী ইজারাদার সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস এই মহতী সভার উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। তিনি মোংলা বন্দরের কৃষক- শ্রমিক আপামর সাধারণ শ্রেণির মানুষের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য মোংলা বন্দরের একটি কলেজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সাহেব তাঁর বক্তব্যে মোংলা বন্দরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এ বন্দরের অগ্রগতি আলোচনা করেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বন্দরের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বন্দরের সাথে এই শহরের উচ্চ শিক্ষার সুযোগের অভাব মোচনের জন্য অনতিবিলম্বে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। মিঃ রেভারেন্ড ফাদার মারিনো রিগন এস, এক্স শিক্ষাকে জাতীর মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে সকল পাশ্চাত্য দেশের অগ্রগতির পেছনে শিক্ষার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, মোংলার সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক সমাজের উন্নতির জন্য অনেক আগেই এখানে

উচ্চ শিক্ষার পদপীঠ হিসেবে কলেজ প্রতিষ্ঠা সমীচীন ছিল। সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ ফ্রান্সিস সুদান হালদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, সুন্দরবন পরিবেষ্টিত পশুর নদীর তীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরে বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলার জনসাধারণ বসবাস করেন। তাঁদের সকলের উচ্চ শিক্ষার কথা বিবেচনা করে অতি শীঘ্রই কলেজ করার পক্ষে বক্তব্য দেন। তিনি আরও বলেন, সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক হিসাবে যতদূর সহযোগিতা করার তিনি তা করবেন। এরপর বক্তব্য রাখেন মোংলা বণিক সমিতির সভাপতি জনাব ডা.আব্দুস সামাদ। তিনি কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে দ্রুত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বণিক সমিতির পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। অতঃপর সভায় বক্তব্য রাখেন জনাব ডা. আব্দুর রহমান, জনাব ইউসুফ আলী সেখ, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব লুৎফর রহমান, মিঃ সুশীল সরকার, মিঃ অম্বরিশ রায়, জনাব আব্দুর রহিম, মিঃ কিরণ চন্দ্র বাছাড়, জনাব আলতাফ হোসেন সহ অনেকে। সকলেই মোংলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এরপর ০৭/১২/১৯৮০ খ্রি. তারিখে সকাল ১০:০০ টায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাধারণ সভায় উপস্থিত জনসাধারণ ও সুধীমণ্ডলীর মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সভাপতিত্ব করেন। বিগত ২৩/১১/১৯৮০ খ্রি. তারিখে মোংলায় কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিভিন্ন কার্যপরিচালনা সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক আলোচনার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। একটি উপদেষ্টা কমিটি
২। একটি সাংগঠনিক কমিটি
৩। একটি স্থান নির্ধারণ কমিটি

মোংলা কলেজের সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভায় ১৫-০১-১৯৮১ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩ টার সময় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোংলা পোর্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সাংগঠনিক কমিটি স্থান নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌর এলাকার মালগাজী-আরাজী মাকোড়ঢোন-সেন্ট পলস্ রোড সংলগ্ন শেলাবুনিয়া এলাকায় "মোংলা কলেজের" স্থায়ী স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য উপস্থিত সাংগঠনিক কমিটির নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দকে দায়িত্ব অর্পণ করেন–

১। জনাব আঃ বাতেন
২। অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস
৩। মিঃ ফ্রান্সিস সুদান হালদার
৪। মিঃ নীরোদ বিহারী পোদ্দার

মোংলা কলেজ সাংগঠনিক কমিটির দ্বিতীয় সভা ১২/০২/১৯৮১ খ্রি. তারিখে সকাল ১০ টায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক মিলনায়তনে জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে জমিদাতা হিসাবে-১। অধ্যাপক কুমার সুনীল কুমার বিশ্বাস ২। মিঃ কুমুদ বিহারী বিশ্বাস ৩। মিঃ বিনোদ বিহারী বিশ্বাস ৪। মিঃ সুধীর বিশ্বাস ৫। মিঃ অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৬। জনাব ডাঃ শেখ ওয়ালিউল্লাহ ও ৭। মিঃ আত্মারাম মন্ডলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসে অন্যান্য সুধীবৃন্দকে জমিদান করার জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৯৮১-১৯৮২ শিক্ষাবর্ষে কলেজের ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মোংলা কলেজের সাংগঠনিক কমিটির তৃতীয় সভা সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয় মিলয়নাতনে ১৫/০৩/১৯৮১ খ্রি.তারিখে বিকাল চার টায় জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কলেজ সুপ্রতিষ্ঠার জন্য কলেজের কার্য পরিচালনার পুরোপুরি দায়িত্ব অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাসের উপর ন্যস্ত করা হয়। অনতিবিলম্বে কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত "মোংলা কলেজ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিবিধ কার্য পরিচালনার জন্য অফিস গৃহের প্রয়োজন বিধায় সেন্ট পলস্ স্কুলের নিকট অবস্থিত মিঃ রনজিৎ কুমার হালদারের ঘরটি সাময়িকভাবে অফিস কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

"মোংলা কলেজ" সাংগঠনিক কমিটির চতুর্থ সভা ২৬/০৪/১৯৮১ খ্রি. তারিখ বিকাল ৪টায় জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে কলেজে অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত মোংলা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি. তারিখ সোমবার স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আফতাব উদ্দিন হাওলাদার কর্তৃক হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮১ সালের মে মাসের ১৮ তারিখে (১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি.) কলেজ ক্যাম্পাসের কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সংসদ সদস্য জনাব আফতাব উদ্দিন হাওলাদার। **এই দিনই 'মোংলা কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস।'**

মোংলা কলেজের সাংগঠনিক কমিটির পঞ্চম সভা মোংলা কলেজের অস্থায়ী কার্যালয়ে জনাব আঃ বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে ১২/০৬/১৯৮১ খ্রি. তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অনতিবিলম্বে একজন সুদক্ষ অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে চলতি শিক্ষাবর্ষ ১৯৮১-১৯৮২ তে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এলাকার সর্বস্তরে প্রতিনিধির সমন্বয়ে "মোংলা কলেজ কার্যনির্বাহী কমিটি" (পরিচালনা পর্ষদ) গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মোংলা কলেজের ষষ্ঠ সভা ০৯/০৭/১৯৮১ খ্রি. সকাল ৯ টায় মোংলা কলেজ কার্যালয়ে জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে মোংলা কলেজের উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাসকে অধ্যক্ষ

পদে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁকে সেদিন (০৯/০৭/১৯৮১ খ্রি.) হতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগ করার জন্য অধ্যক্ষ মহাদয়কে সর্বসম্মতিক্রমে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকার সর্বস্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে মোংলা কলেজ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত তেইশ (২৩) সদস্য বিশিষ্ট প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

১ মহকুমা প্রশাসক	– সভাপতি
২. জনাব আঃ বাতেন (পৌর চেয়ারম্যান)	– সহ-সভাপতি
৩. মিঃ সুনীল কুমার বিশ্বাস (অধ্যক্ষ)	– সম্পাদক
৪. মিঃ রেভারেন্ড ফাদার মারিনো রিগন এস, এক্স	– সদস্য
৫. জনাব আঃ গণি সি, আই, মোংলা থানা	– সদস্য
৬. মিঃ ফ্রান্সিস সুদান হালদার	– সদস্য
৭. মিঃ নীরোদ বিহারী পোদ্দার	– সদস্য
৮. জনাব আলহাজ্ব আবু বক্কর সিদ্দিক	– সদস্য
৯. জনাব ইউসুফ আলী সেখ	– সদস্য
১০. মিঃ প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস	– সদস্য
১১. জনাব আলহাজ্ব আঃ গফুর	– সদস্য
১২. মিঃ অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	– সদস্য
১৩. জনাব ডাঃ সৈয়দ নাজিম আলী	– সদস্য
১৪. জনাব আঃ আজিজ হাওলাদার	– সদস্য
১৫. জনাব ইদ্রিস আলী ইজারাদার	– সদস্য
১৬. জনাব তোফাজ্জেল হক	– সদস্য
১৭. জনাব ওয়ালীউল্লাহ	– সদস্য
১৮. ভি.ডি.পি অফিসার মোংলা থানা	– সদস্য
১৯. জনাব নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক সংঘ	– সদস্য
২০. জনাব আঃ বাসার ঠাকুর	– সদস্য
২১. জনাব আঃ গণি শরীফ	– সদস্য
২২. মিঃ বিমল কৃষ্ণ মন্ডল	– সদস্য
২৩. জনাব সিরাজুল ইসলাম	– সদস্য

"মোংলা কলেজ" পরিচালনা পর্ষদ অর্থাৎ কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা ১৯৮১ সনের ৩১ শে জুলাই শুক্রবার সকাল ৯টায় কলেজ কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি মহকুমা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল সদস্যের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

(১) তহবিল অপ্রতুল হওয়ায় অর্থ সরবরাহের জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণকে অবিলম্বে মোংলা বন্দর ও থানা এলাকার সকল সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

(২) ০৯-০৭-১৯৮১ খ্রি. তারিখের মোংলা কলেজের সাংগঠনিক কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধ্যক্ষ যে সমস্ত বিষয়ের প্রভাষকগণকে অস্থায়ী নিয়োগপত্র প্রদান করেন তারা হলেন–

১। মি. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (বাংলা বিভাগ)
২। মি. এ. বি. এম. এনামুল কবীর (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)
৩। মি. স্বপন কুমার বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ)
৪। মি. জালালউদ্দিন আহমেদ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ/পৌরনীতি)
৫। মি. সুশীল কুমার সরকার (বাংলা বিভাগ)।
৬। মি. সুশান্ত কুমার দাস (পদার্থ বিজ্ঞান)

মোংলা কলেজের সকল প্রকার দফতর সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মি. বিজন বিহারী রায় ও মি. মহসীন আকনকে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই ছয়জন শিক্ষকই মোংলা কলেজের প্রথম নিয়োগকৃত শিক্ষক।

মোংলা কলেজ কার্যনির্বাহী কমিটির (কলেজ পরিচালনা পর্ষদ) দ্বিতীয় সভা মোংলা কলেজ কার্যালয়ে ৩০/০৮/১৯৮১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে মি. রেভারেন্ড ফাদার মারিনো রিগন এস. এক্স. এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৩১/০৭/১৯৮১ খ্রি. তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। তা হলো–

১) মোংলা কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে চালনা বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (শ্রেণি কার্যক্রম) ক্লাস করার অনুমতি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

২) ০৯/ ০৯/ ১৯৮১ খ্রি. তারিখ বুধবার মোংলা কলেজের শুভারম্ভের দিন ধার্য করা হয় এবং মহকুমা প্রশাসক (বাগেরহাট), বন্দর চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং সংসদ সদস্য জনাব আফতাব উদ্দিন হাওলাদারের উপস্থিতিতে মোংলা কলেজের ক্লাস শুভারম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায়– ১) জনাব সৈয়দ আব্দুস সোবহান (ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ) ২) জনাব ইব্রাহীম হোসেন সরদার (প্রধান শিক্ষক চালনা বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) কে মোংলা কলেজ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ কার্যনির্বাহী কমিটি (কলেজ পরিচালনা পর্ষদ) তেইশ (২৩) থেকে পঁচিশে (২৫) বৃদ্ধি করা হয়।

মোংলা কলেজ কার্যনির্বাহী কমিটির চতুর্থ সভা ০৫/১১/১৯৮১ খ্রি. তারিখ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল বাতেন সাহেবের সভাপতিত্বে কলেজ কার্যালয়ে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।

মোংলা কলেজের কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভাতে একে, একে অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে মোংলা কলেজে পরিদর্শনে আসেন। তখন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাসকে সুধী সমাজ, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক সংঘ ও বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ সর্বসাধারণ সকলেই সহযোগিতা করেন। ০১/০৭/১৯৮২ খ্রি. তারিখ যশোর শিক্ষা বোর্ড "মোংলা কলেজ"-কে নিম্নবর্ণিত শাখা ও বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি দেয়।

মানবিক শাখায়– বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাস।
বিজ্ঞান শাখায়– বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত।
বাণিজ্য শাখায়– বাংলা, ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল।

১৯৯৫ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মোংলা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে সমাজকল্যাণ, ইসলাম শিক্ষা, সংস্কৃত বিভাগ খোলা হয়। ২০০০ সালে ডিগ্রি কোর্সের জন্য সমাজকর্ম, ইসলাম শিক্ষা, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ খোলা হয়। ২০১১ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ভূগোল বিষয় যুক্ত হয়। উল্লেখ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যখন ডিগ্রি (পাস) কোর্সের অনুমতি দিয়েছিলো তখন মার্কেটিং বিষয়টা সংযুক্ত ছিল। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে মোংলা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ মোঃ গোলাম সরোয়ার অনার্স কোর্স খোলার জন্য পরিচালনা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পরিচালনা পরিষদ অনুমোদন দেন। অত্র এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাস এবং সহকারী অধ্যাপক গাজী তৈয়াবুর রহমান সহ অনেক শিক্ষকের ভূমিকা ছিল। অনার্স কোর্সের অনুমোদনের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক বড় ভূমিকা পালন করেন। এরপর ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সের স্বীকৃতি দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে মোংলা বন্দরে জয়মনির ঘোলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খাদ্যগুদাম "সাইলো" উদ্বোধনকালে স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য জনাব হাবিবুন নাহার তাঁর বক্তৃতায় দক্ষিণ অঞ্চলের এই জনপদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান "মোংলা কলেজ" কে সরকারিকরণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী করেন। প্রধানমন্ত্রী কলেজটি সরকারি করার আশ্বাস প্রদান করেন। মোংলার কৃতি সন্তান জনাব ড. নমিতা হালদার (এন.ডি.সি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ হন। ইতঃপূর্বে উপ-সচিব পদমর্যাদায় থাকাকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পরিচালক ছিলেন। তখনও তিনি মোংলা কলেজ সরকারিকরণের চেষ্টা করেছিলেন। ড.নমিতা হালদার (এন.ডি.সি) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ হয়েই "মোংলা কলেজ" সরকারিকরণের ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন। তিনি মোংলা কলেজ প্রশাসন এবং সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মি. ফ্রান্সিস সুদান হালদারের সাথে মোংলা কলেজ সরকারিকরণের বিষয়ে কথা বলেন। পরবর্তীতে তাঁর আন্তরিকতায় গত ২৬-০৮-২০১৪ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০১.০০০.০০.০৬.২০১৪-৫৩ পত্র জারি হয়। এই প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা-৯ (কলেজ-৪) স্মারক নং -৩৭.০০.০০০০.০৭০.০৯.০০৯.১৪-২৮৪ তারিখ ০৩-০৯-২০১৪ খ্রি. এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর স্মারক

নং-ও এম/২৪সি-১ /২০১৪/১২৬১৪(১৩)/ সি-১ , তারিখ ২৭-১০-২০২৪ খ্রি. মোতাবেক কলেজটি সরকারিকরণের লক্ষ্যে ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ৩০-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোংলা কলেজ সরকারিকরণের জি.ও জারি করে। সেজন্য ৩০-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখে "মোংলা কলেজ"– "মোংলা সরকারি কলেজ" নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোংলা কলেজ সরকারিকরণে আর একজনের ভূমিকার কথা না বললেই নয়, তিনি বাগেরহাটের কৃতি সন্তান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, তৎকালীন সময়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন (এন.ডি.সি)। তিনি মন্ত্রণালয়ে সরকারিকরণের ফাইল গেলে সেটাকে দ্রুত কার্যসম্পাদন করার ব্যবস্থা করতেন। এমন কি "দানপত্র দলিল" দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য মাউশি তে কলেজের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। যার জন্য এক দিনের মধ্যে মাউশি থেকে আমাদের "দানপত্র দলিল" করার চিঠি হয়েছিল।

এছাড়া, মোংলা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার, মোংলা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ, মোংলা কলেজের প্রাক্তন-বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মোংলা বন্দরের শ্রমিকবৃন্দ, ব্যবসায়ীবৃন্দসহ মোংলার সর্বস্তরের জনসাধারণের একান্ত সহযোগিতায় মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সরকারিকরণসহ এপর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

মোংলা সরকারি কলেজে বর্তমানে ৫টি ভবন রয়েছে। ৫টি ভবনের মধ্যে রেভারেন্ড ফাদার মারিনো রিগন এস. এক্স. -এর নামে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এই গ্রন্থাগারটি ফাদার রিগনের অনুদানে নির্মিত। বর্তমানে কলেজে ৫.২০ একর জমি আছে, কলেজের চারপাশের গাছপালা বেষ্টিত সীমানাপ্রাচীর রয়েছে, দুইটা গেট রয়েছে। দক্ষিণ গেটে ঢুকেই ডানপাশে একটি সুন্দর পুকুর রয়েছে, কলেজের সামনে সুবিশাল একটি খেলার মাঠ রয়েছে, মাঠসংলগ্ন পশ্চিমপাশে একটি সুন্দর শহীদমিনার রয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাস) এবং অনার্স কোর্স মিলে প্রায় ২৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

মোংলা কলেজ ও পরবর্তীতে মোংলা সরকারি কলেজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে তাঁদের দায়িত্বের সময় কাল তুলে ধরা হলো:-

১। জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস- (১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি. - ২৬/১১/২০০৪) খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২। জনাব মোঃ তৈয়াবুর রহমান গাজী (সহকারী অধ্যাপক জীববিজ্ঞান)- (২৭/১১/২০০৪ খ্রি. - ০৯/০৫/২০০৮) খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। জনাব সুশীল কুমার সরকার (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা)- (১০/০৫/২০০৮ খ্রি.-৩০/০৬/২০১০) খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার (০১/০৭/২০১০ খ্রি. - ২৯/০৩/২০১৬)খ্রি. পর্যন্ত মোংলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

"মোংলা সরকারি কলেজ" এ যারা দায়িত্ব পালন করেছেন।

১। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার (প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) (৩০/০৩/২০১৬ খ্রি.-০৪/০৩/২০২২) খ্রি. পর্যন্ত প্রথমে অফিসার ইনচার্জ তারপরে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২। জনাব কুবের চন্দ্র মণ্ডল (প্রভাষক, ইতিহাস) (০৫/০৩/২০২২-২২/০২/২০২৩) খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। জনাব প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য (২৩/০২/২০২৩ খ্রি. - ৩০/০৫/২০২৩) খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪। জনাব মল্লিক অহিদুজ্জামান (প্রভাষক, অর্থনীতি) (৩১/০৫/২০২৩ খ্রি. - ৩১/০৮/২০২৩) খ্রি., পর্যন্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৫। জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন (প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) (০১/০৯/২০২৩ খ্রি.-২৮/১০/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৬। জনাব প্রফেসর কে এম রব্বানী (২৯/১০/২০২৩ খ্রি. - বর্তমান) পর্যন্ত মোংলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য "মোংলা সরকারি কলেজ" এর প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি তিন মাসের কিছু দিন বেশী "মোংলা সরকারি কলেজে" সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুরের স্কুল পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব প্রফেসর কে এম রব্বানী বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যশোর বোর্ডে কলেজ পরিদর্শক হিসেবে প্রায় ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তার হাত ধরে "মোংলা সরকারি কলেজ" এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা মোংলা সরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী এবং মোংলার সবস্তরের মানুষের।

১৯৮১ খ্রি. থেকে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসন, শিক্ষা ক্যাডার, কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিক্ষার্থী, ভালো-ভালো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করবে এ প্রত্যাশা রাখি।

মোংলা সরকারি কলেজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে নির্দেশনা ও তথ্য দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাস এবং সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও মোংলা কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মি. ফ্রান্সিস সুদান হালদার। এছাড়াও আমার সহধর্মিনী ড. অপর্ণা অধিকারী আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। মোংলা সরকারি কলেজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মোংলা কলেজের রেজুলেশন বই দিয়ে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন এ জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় আপামর সকল শ্রেণির মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল। এ জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সেই সাথে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম আমার এই লেখায় উল্লেখ্য করতে পারিনি তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

পরিশেষে "মোংলা সরকারি কলেজ" দক্ষিণাঞ্চলে সমস্ত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিত লাভ করুক এই প্রত্যশা করি।

কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (CPD)

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (CPD) প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ। ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ণের জন্য এই প্রশিক্ষণ সময়ের দাবি। বর্তমান বিশ্ব এখন যে দিকে যাচ্ছে তাতে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত না করে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই প্রশিক্ষণ প্রধানত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে, যা প্রচলিত শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষায় দৃষ্টি প্রধানত শিক্ষকের উপর থাকে, অন্যদিকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষায় দৃষ্টি প্রধানত শিক্ষার্থীর উপর থাকে এবং যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় রাখে। আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি কার্যকর হয়। এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংক্রিয় রেখে অভিজ্ঞতা লাভের পন্থা দেখাতে পারে। যার মাধ্যমে শিক্ষক একজন ধীরগতির শিক্ষার্থীর স্বল্পতা খুঁজে বের করতে পারেন এবং তার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন। এখানে একজন শিক্ষক তার প্রচলিত ভূমিকা পালন করেন না, বরং তিনি একজন সাহায্যকারী হয়ে ওঠেন। একজন ফ্যাসিলিটেটর হতে হলে একজন শিক্ষককে তার পেশাগত উন্নতির জন্য ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষা, সঠিক পাঠ-পরিকল্পনা, সক্রিয় শিক্ষণ কৌশল, সঠিক মূল্যায়ন, যথার্থ প্রতিক্রিয়া, শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এই প্রশিক্ষণকে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ফলপ্রসূ করতে হলে শ্রেণি কক্ষের অবকাঠামগত উন্নয়ন, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, শিক্ষা নেতৃত্ব, শিক্ষকের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

বাংলা ভাষা ও আমাদের মর্যাদা

পাপিয়া হালদার
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

মা, মাটি এবং মাতৃভাষা– মানবজীবনের প্রতি রক্ত কণিকার সাথে মিশে আছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে ভাষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণরা বুকের তাজা রক্ত অবলীলাক্রমে ঢেলে দিয়েছে। রাজশাহীর চারঘাট এলাকার রাস্তার পাশে একটি ছোট কুটির এবং উঠানের মাঝখানে একটি শহিদ মিনার আছে। আর ছোট কুটিরের মধ্যে বসবাস করেন সাহেরা বিবি। ১৯৫২ সালে তার ছেলে ভাষার জন্য শহিদ হন। তারপর থেকে সাহেরা বিবি আর কথা বলেননি, নির্বাক হয়ে যান। শুধু সারাক্ষণ কুটিরে বসে ঐ শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে বাংলা ভাষার জন্য।

ইংরেজ শাসনামলে প্রায় দু'শ বছর ইংরেজি ছিল এদেশের ভাষা। এরপর ছাত্র অন্দোলনের ফলে বি.এ. পাশ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হয় বাংলা এবং অফিস, দোকান, গাড়ি সবকিছুর নাম ও নাম্বার বাংলায় শুরু হয়েছে। তারপর আশা করা হয়েছিল যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়বে, কিন্তু তা আর হলো না বরং পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিল উর্দুকে। ফলে ভাষার জন্য বাংলার দামাল ছেলেরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়েছিল। যার মর্যাদা আমরা পেয়েছি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

" মোদের গরব মোদের আশা–
আ মরি বাংলা ভাষা "

এই রক্ত বৃথা যায়নি বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ।

বিজ্ঞান–ধর্ম–দর্শন

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বিজ্ঞান কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Science যা ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো জ্ঞান বা জ্ঞানবিদ্যা। সাধারণত বিজ্ঞান বলতে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ সুসংবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। আবার ব্যাপক অর্থে যে-কোনো যুক্তিযুক্ত সুশৃঙ্খল আলোচনাকে বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞান কতকগুলি Law আবিষ্কার করে এবং এই Law of nature নিয়েই বিজ্ঞানের কার্যকলাপ।

বিজ্ঞান দুটি ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure Science) এবং কার্যে প্রযুক্ত বিজ্ঞান (Applied Science)। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান শুধুমাত্র সত্য আবিষ্কার করে এবং কার্যে প্রযুক্ত বিজ্ঞান সে সব সত্যকে মানুষের উপযোগী করে কাজে লাগায়। বিজ্ঞান দ্বারা মানুষের উপকার বা ক্ষতির দায়-দায়িত্ব কার্যে প্রযুক্ত বিজ্ঞানের উপর পড়ে।

পারমানবিক শক্তি দিয়ে পৃথিবীর অনেক কল্যাণ করা যায় আবার হিরোশিমায় মার্কিনীরা যা করেছে সেটাও করা যায়, তবে এর দায়িত্ব কোনোক্রমেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নেবে না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলে প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র একটা একত্ব (Uniformity) আছে এবং আবিষ্কৃত সূত্রগুলো পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানসহ সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। যদি এর ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে বিজ্ঞান গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন একটি সূত্র আবিষ্কার করে সেটাকে প্রয়োগ করবে। বিজ্ঞান যদি কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে না পারে তবে বলবে সূক্ষ্মতর আরও কোনো সূত্র আছে যা আমরা এখনো জানতে পারিনি। তবুও কোনো অবস্থাতেই অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করবে না।

বিজ্ঞান বলে সব কিছুই প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির ওপারে কিছুই নেই। কিন্তু ধর্ম প্রবক্তাদের প্রধান আপত্তি হলো এই "নেই" কথাটায়। তাদের বক্তব্য হলো বিজ্ঞান যা আছে সেই কথাটাই বলতে পারে। কিন্তু যা নেই সে সম্পর্কে কোনো Prediction করার অধিকার বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞান সত্য আবিষ্কার করে বটে তবে চরম সত্য আবিষ্কার করে না। বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু ভেঙ্গে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে এবং এর ভেতরে রয়েছে শুধুমাত্র শক্তি। বৈজ্ঞানিকগণ ইলেকট্রনের Orbital motion পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের মধ্যে বোধ হয় একটা চেতনা

(Conciousness) আছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, চেতনাযুক্ত এ Energy কে স্বীকার করা এবং ঈশ্বরকে স্বীকার করা একই।

এবার আসা যাক ধর্মের কথায়। ধৃ-ধাতু থেকে ধর্ম শব্দটি এসেছে। ধৃ-অর্থ ধারণ করা। এ অর্থে যাকে ধারণ কোরে মানুষ সেই পরম সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাই ধর্ম। Oxford Dictionary তে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'ধর্ম হলো উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেয়া, যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও উপাসনা পাবার অধিকারী'। সুতরাং অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসই ধর্মের মূল কথা। পৃথিবীতে এমন কোনো মানব সমাজ নেই যেখানে ধর্ম বিশ্বাসী লোক নেই অথবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় না। তাই মানব জীবনে ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

বিজ্ঞানী আইস্টাইনের ভাষায়– "Science without religion is crippled and religion without science is blind."

আমরা জানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে যে পানি উৎপন্ন হয় তা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। কিন্তু হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মধ্যে এই তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা নেই। এই তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা অর্থাৎ পানির এই গুণকে বলা হয় উন্মেষিত গুণ (Imergent virtue)। এই উন্মেষিত গুণ কোথা থেকে এলো এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের জানা নেই। তবে ধর্মের কাছে এর উত্তর আছে। ঈশ্বরবাদীদের যুক্তি হলো ঈশ্বর আছেন তাই তাঁর কৃপায় এ সব গুণের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

দর্শনের আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা। গ্রিক দার্শনিক Thales থেকে দর্শনের শুরু। দর্শনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Philosophy কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন গ্রিক চিন্তাবিদ পিথাগোরাস।

দর্শন সামগ্রিকভাবে অখণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। বিশ্বজগৎ কী জড় দিয়ে তৈরি, নাকি চেতনা দিয়ে তৈরি? বিশ্বের উদ্দেশ্য কী যান্ত্রিক না উদ্দেশ্যমূলক? নাকি এই বিশ্ব তৈরির পিছনে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা আছে? দর্শন এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে, যার মধ্যে বুদ্ধির প্রতিফলন থাকে।

দর্শন ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। দর্শন তার বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করার জন্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। দর্শন বিজ্ঞান ছাড়া শূন্যগর্ভ এবং বিজ্ঞান দর্শন ছাড়া অন্ধ।

অপরদিকে, ধর্ম ও দর্শন উভয়ের মূলে রয়েছে সত্যপ্রীতি ও সত্যানুসন্ধান। উভয়ের মূল লক্ষ্য পরম সত্যকে জানা। পার্থক্য হলো– ধর্ম পরম সত্যকে জানতে চায় হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে আর দর্শন তাঁকে জানতে চায় যুক্তি ও চিন্তার আলোকে। দার্শনিক হেগেল সেজন্য ধর্মকে বলেছেন "সাধারণ মানুষের

দর্শন”। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করাই হলো দর্শনের উদ্দেশ্য।

সুতরাং বিজ্ঞানের জড়বাদ নয়, ধর্মীয় গোড়ামী নয়, কিংবা দর্শনের অতি তাত্ত্বিকতা নয়, সুন্দর সমাজের জন্য প্রয়োজন যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী। আর বিজ্ঞানমনস্কতা হলো সত্যকে উদারভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা। মনুষ্যত্বই মানুষের প্রধান ধর্ম। এই মনুষ্যত্ব অর্জনই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। খন্ডিত জীবন নয়, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য চাই বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শনের সমন্বয়। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা মানুষের ভিতরে যে মানবিকতা বোধ রয়েছে তাকে জাগরিত করতে পারবো। আর এই মানবিকতাবোধই হবে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বসমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি।

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

আর্য সভ্যতার যুগে প্রবর্তিত এবং আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর থেকে খ্রিষ্টপূর্ব তিনশো বছর পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বেদনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা হয় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা। চিত্রকলা ও লিখন উপকরণ সামগ্রি প্রচলনের প্রারম্ভিক সময়ে আর্য ঋষিগণ উদ্ভব করেছিলেন গুরুর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি। এটির উদ্দেশ্য ছিল গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি আদর্শ সম্পর্ক সৃষ্টি এবং পরিমিত পারিবারিক বোধের মাধ্যমে শিষ্যদের নতুন জীবন দান। গুরু–শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে বৈদিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তখনকার দিনের শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলকভাবেই গুরুকুলবাসের শিক্ষা। বিদ্যার্থীকে তার শিক্ষাজীবনের সবটুকু সময়ই তার গুরুগৃহে গুরুর পরিবারের একজন আবাসিক হয়ে বাস করতে হতো। শিষ্য শুধু তাঁর গুরুর মৌখিক উপদেশ বা পুঁথিগত ভাষণ থেকেই শিক্ষালাভ করত না, বরং সে শিক্ষালাভ করত গুরুর প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শকে দেখে, যে আদর্শ প্রতিফলিত হতো গুরুর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্যে। গুরুগৃহবাসের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল তাঁর কাছে শিক্ষণীয়।

নবীন শিক্ষার্থীদের বিদ্যাশিক্ষার যাত্রা শুরু হতো "বিদ্যারম্ভ ও অক্ষর স্বীকরণ" নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বর্তমান যুগেও 'হাতেখড়ি' নামক এ জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। প্রাথমিক শিক্ষাটা অবশ্য পরিবারের মধ্যে পিতার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হতো। বেদের জটিলতা ও বোধগম্যের অসুবিধার দরুণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গুরুকুল ও আচার্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

গুরুকুল :

বৈদিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বলতে গুরুকুল বা গুরুর আশ্রমকে বোঝাত। তপোবন (আশ্রম) হচ্ছে ভারতের আদি বিদ্যালয় এবং আর্যঋষিরা হচ্ছেন আদি গুরুকুল। তপোবনের গুরুকুলগণ হলেন শিক্ষার্থীদের কাছে পুণ্যতীর্থ স্বরূপ। পরিবারে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উপনয়নের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গমন করতো। বৈদিক শিক্ষার গুরুকুল পদ্ধতি দাঁড়িয়েছিল সরাসরি ছাত্র শিক্ষক ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর এবং এটি ব্যক্তিগত শিক্ষক পদ্ধতির উপর দারুণভাবে ঋণী ছিল। শিক্ষকদের

অবিরত উপস্থিতি, তাঁদের বাস্তব জীবনযাপন পদ্ধতি এবং ছাত্রদের প্রতি অনুজ্ঞা ও আদেশাত্মক আচরণ, ছাত্রদের উন্নত চরিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সহায়ক ছিল।

উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম :

বৈদিক শিক্ষায় গুরুরা উপনয়ন নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিষ্যকে ব্রহ্মচারী হিসেবে দ্বিতীয় জন্ম দিতেন। গুরুগৃহে থাকাকালে শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। কয়েকটি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম নিষ্ঠাসহকারে মেনে চলতে হতো এবং তার মধ্য দিয়েই শিষ্যের শিক্ষালাভ ঘটতো।

শিষ্যের পালনীয় বিধি :

আপন (নিজের) নাম গোত্র বলে গুরুকে অভিবাদন করতে হতো। গুরুর নাম না বলে গুরুমশায়, আচার্য মহাশয়, বা উপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি ভাষায় পরিচয় দিতে হতো।

শিষ্যের দায়িত্ব :

শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে অনেক কাজ করতে হতো। গুরুর সেবা করা, গুরুগৃহ পরিষ্কার করা, পূজার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা, গো-পালন করা, গুরুর পরিবারের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা লাভ করত। ফলে, স্বাবলম্বী, কর্মক্ষমতা, শ্রমের মর্যাদা, মনুষ্যত্ববোধ, আত্মত্যাগ, সেবামূলক মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হত।

নিঃশুল্ক বা অবৈতনিক শিক্ষা :

আশ্রমের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আত্মবিকাশের অনুকূল ছিল। গৃহ পরিবেশ থেকে দূরে, প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আশ্রমিক ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি নিঃশুল্ক বা অবৈতনিক। ছাত্রছাত্রীদের (বৈদিক যুগে নারীরাও শিক্ষিত ছিলেন ৮/৯১/১, ১/১১৭/৭, ১০/৪০/১) শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষককে কোনো বেতন দিতে হতো না। বরং শিক্ষকরা ছাত্রদের বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি দিয়ে শিক্ষাদান করাকে বেশ সম্মানজনক কাজ বলে ভাবতেন। শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা তাদের সাধ্যানুসারে গুরুদক্ষিণা দিত। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষা করে আশ্রমের খরচ চালাতেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের ভিক্ষা দিতেন।

পাঠদান :

বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় সীমিত বিষয়ের উপর পাঠদান করা হতো। চারটি বেদ, ব্যাকরণ, ধ্বনিবিজ্ঞান, ছন্দ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হতো। উপনিষদও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠক্রমের মধ্যে আরও স্থান পেয়েছিল ইতিহাস, রাশি (গণিত), পুরাণ, ভূতবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, বাক্যাবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, দণ্ডনীতি, আয়ুর্বেদ, পশুপালন, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হতো।

শিক্ষাদান পদ্ধতি :

১। উপক্রম– এটি বেদ পাঠ পর্বের পূর্বের এক অনুষ্ঠান। প্রথমে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের উপক্রম বা প্রস্তুতি করা হতো।

২। শুশ্রূষা– আচার্যের পাঠদান শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল শুশ্রূষা।

৩। শ্রবণ– শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ।

৪। গ্রহণ– বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির চেষ্টা।

৫। ধারণ– অভ্যাসের দ্বারা বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুটি পড়ানো হল সেটিরই আবৃত্তি করানো হতো।

৬। উহ্যপৌহ (আলোচনা)– আলোচনার দ্বারা বিষয়বস্তুর উপলব্ধির প্রয়াস। শিক্ষকরাও এই আলোচনায় যোগ দিতেন।

৭। অর্থবিজ্ঞান– আচার্যের দেয়া বিষয়বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা।

৮। তত্ত্বজ্ঞানম্– সত্যের ধারণা, গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যেমন, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ। জটিল ও নীরস বিষয়কে সহজ করে নেয়ার পক্ষে এই পদ্ধতির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

শিক্ষাকাল :

উপনয়নের মাধ্যমে বৈদিক শিক্ষা শুরু হতো। আট বছর বয়স থেকে শুরু করে বারো বছরের শিক্ষাক্রমটি শেষ হতো সমাবর্তন (চার বেদ অধ্যয়ন পর্যন্ত) অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক :

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। গুরু শিষ্যকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, শাসন করতেন। শিষ্য গুরুকে পিতার মতো শ্রদ্ধা ও সমীহ করত।

বৈদিক শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক; গুরুর কথাই ছিল শেষ কথা কোনো প্রতিবাদের অবকাশ ছিল না।

তথ্যসূত্র :

১। বেদ (ঋগ্বেদ-সংহিতা ১ম ও ২য় খণ্ড)

২। Ancient Indian Education-R.K.Mookherji

Conservation of Biodiversity: Perspective Bangladesh

Professor K. M. Rabbani
Principal, Mongla Govt. College

1. Introduction

Biodiversity, the variety of life on Earth, plays a crucial role in maintaining ecological balance and sustaining all forms of life. In recent years, the conservation of biodiversity has become a global priority as threats like habitat destruction, climate change, and overexploitation of resources continue to impact our planet.

Bangladesh is situated in the world largest deltaic plain – the Ganges–Brahmaputra delta, in the northeastern part of South Asia between 20°34/ and 26°38/ North latitude and 88°01/ and 92°41/ East longitude. The country mostly consists of floodplains with some hilly areas, with a subtropical monsoon climate. In the country, about 80% of the land is low-lying and/or flooded at least during the monsoon, makes the country the single largest flood-basin in South Asia. The majority of country's land is formed by river alluvium from the Ganges and the Brahmaputra and their tributaries. Geographically, the country falls near the Indo-Burma region – one of the global biodiversity hot-spot and believed to have more than 7,000 endemic plant species. Bangladesh, due to its unique geophysical location and a suitable climatic condition is exceptionally endowed with a rich variety of biodiversity. Nevertheless, in last decades, like most other regions of the world, Bangladesh also went through a critical period unsuitable for country's biodiversity and ecosystem. The government so far along with various international conservation agencies has also been trying to improve and manage this over verwhelming situation. This article aims to provide an insight of the biodiversity of Bangladesh, from ecosystem to species level, genetic diversity, and major threats to the biodiversity in the country with key initiatives so far taken for biodiversity conservation.

In the context of Bangladesh, a country known for its unique ecological diversity and rich natural heritage, the preservation of biodiversity takes on added significance. This article examines the importance of biodiversity conservation in Bangladesh and the efforts undertaken to protect its valuable ecosystems and species.

Keywords: Bangladesh, Biodiversity, Biodiversity Coservation, Ecosystem, wildlife

2. Biodiversity in Bangladesh

Bangladesh's geographical location at the confluence of the Ganges, Brahmaputra, and Meghna rivers, coupled with its varied climatic zones, has bestowed the country with a rich tapestry of biodiversity. This diverse landscape encompasses floodplains, mangroves, hills, forests, and wetlands. These ecosystems provide niches for a plethora of species, ranging from the majestic Bengal Tiger to the elusive Gangetic dolphin.

3. Significance of Biodiversity Conservation

- **Ecosystem Services:** Biodiversity provides vital ecosystem services such as pollination of crops, water purification, regulation of climate and disease control. These services are fundamental to human survival and well-being.
- **Cultural and Economic Value:** Biodiversity is interwoven with the cultural fabric of Bangladesh. It influences art, cuisine, traditional practices, and spiritual beliefs. Moreover, biodiversity contributes to the economy through fisheries, agriculture, forestry, and tourism.
- **Genetic Resources:** Bangladesh's biodiversity reservoir harbours a treasure trove of genetic resources with immense potential for advancements in medicine, agriculture, and biotechnology.
- **Plant and Wildlife Diversity in Bangladesh**

In Bangladesh, some 2,260 species of plant reported alone from the Chittagong Hill Tracts, which falls between two major floristic regions of Asia (MoEF, 1993). Until now, an estimated 5,700 species of angiosperms alone, including 68 woody legumes, 130 fibre yielding plants, 500 medicinal plants, 29 orchids, 3 gymnosperms and 1,700 pteridophytes have been recorded from the country. The country also possesses a rich faunal diversity. Bangladesh is home of about 138 mammal species,

more than 566 species of birds (passerine and non-passerine), 167 species of reptiles, 49 species of amphibians (IUCN, 2015). In addition to that, at least 253 species of fish (inland freshwater), 305 species of butterflies, 305 species of shrimp/prawn, 2,493 species of insects, 362 species of mollusks, 66 species of corals,

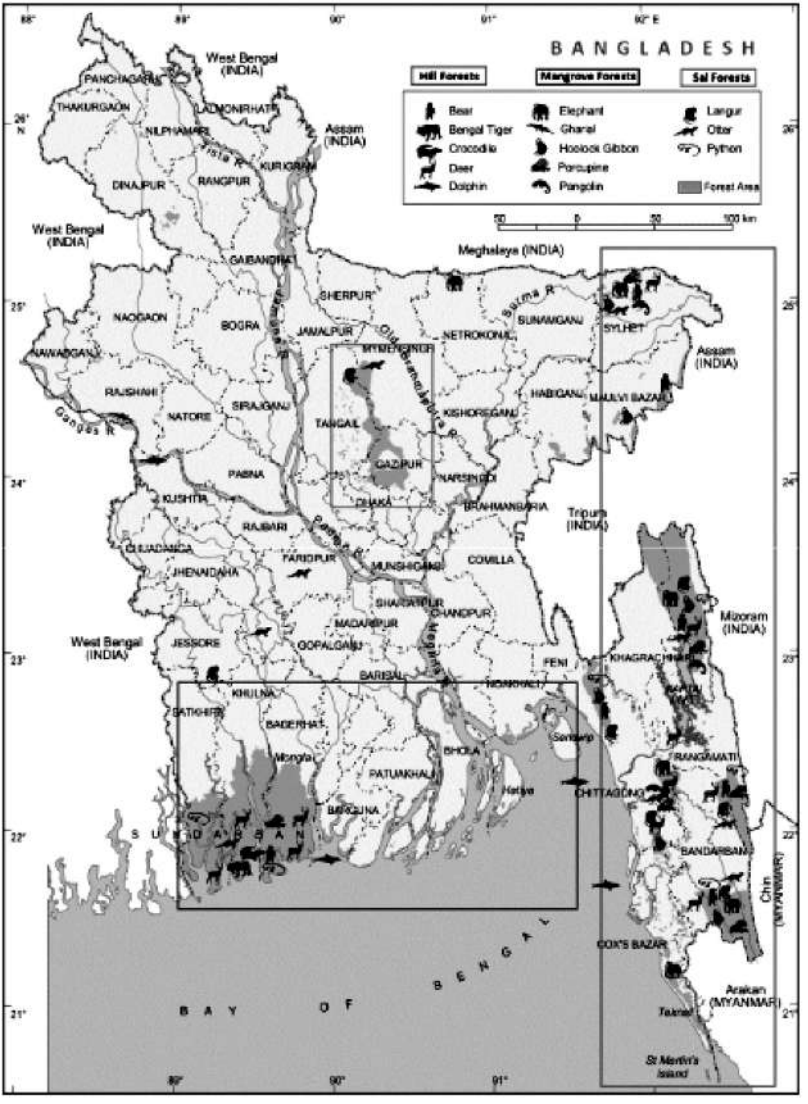

FIGURE 1. Major forest types and distribution of wildlife in Bangladesh.

(Fig : Sharif A. Mukul, Shekhar R. Biswas and A. Z. M. Manzoor Rashid)

15 species of crabs, 19 species of mites, 164 species of algae, 4 species of echinoderms are believed to be exist in the country (IUCN 2015 & 2000; Islam et al., 2003).

4. Challenges and Mejor Threats to Biodiversity Conservation

- **Habitat Destruction:** Rapid urbanization, agricultural expansion, and infrastructure development lead to habitat loss and fragmentation, endangering numerous species.
- **Overexploitation:** Unsustainable hunting, fishing, and logging practices disrupt the balance of ecosystems and lead to population declines.
- **Pollution:** Industrial, agricultural, and domestic pollutants contaminate water bodies and soil, negatively impacting aquatic and terrestrial ecosystems.
- **Invasive Species:** Introduced species can outcompete native species, disrupting ecosystem dynamics and leading to the decline of native flora and fauna.
- **Climate Change:** Rising temperatures, altered precipitation patterns, and sealevel rise affect species' habitats, distribution, and behavior, threatening their survival.
- Biodiversity loss in Bangladesh is attributed to several socio-economic, biophysical and organizational factors (Mukul, 2014b & 2012a). Following are some key reasons behind the rapid biodiversity loss in the country.
- High population density, extreme poverty and unemployment: Bangladesh is one of the world's densely populated countries with an extreme poverty and high unemployment rate. More than 85% population of the country are living in rural areas and somehow depends on various natural resources which lead to exploitation of plant and animal products for people's livelihood and income (Mukul 2012a). Rural fuel consumption pattern, which is strongly concerned with degradation of natural forest area is another important issue related to biodiversity depletion in the country.
- Climate change and sea level rise: Bangladesh is one of the largest victims of climate change and associated sea level rise. The majority of the country

will go under water if the water level rises by 50 cm. The country has already experienced severe change in precipitation pattern, temperature etc. The climate change in the country will largely impact the persistence of large living animals and the ecosystems of which they are part .

- Habitat loss, degradation and fragmentation: Biodiversity conservation is strongly associated with the intact ecosystems and natural landscape; however, transformation of land use patterns, expansion of agricultural lands, changes in cropping pattern, introduction of high yielding varieties, urbanization, expansion of road networks, embankments and other manmade factors have caused immense damage to wild habitats in all ecosystem types in the country. Following are some common reason of habitat loss, degradation, and fragmentation: (Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 14 February 2017 doi:10.20944/preprints201702.0045.v18)
- Illegal poaching, logging and fuel wood collection: There is a big international market of unregulated wild animals and their parts (e.g. teeth, bones, fur, ivory) mainly for their aesthetic and medicinal value (see Mukul et al., 2012b& 2014b). Besides, illegal logging, fuelwood collection, unsustainable harvest of nontimber forest products including medicinal plants are also responsible for the depletion of biodiversity in the country (Mukul et al., 2010; Khan et al., 2009).

5. Conservation Efforts in Bangladesh

Protected Areas: Bangladesh has established a network of protected areas, including national parks, wildlife sanctuaries and ecoparks to safeguard critical habitats and species. As of 2022, the World Database of Protected Areas lists 51 protected areas in Bangladesh, including:

- Altadighi National Park
- Bangabandhu Safari Park, Cox's Bazar
- Bangabandhu Safari Park, Gazipur
- Baroiyadhala National Park
- Barshijora Eco-Park

- Bhawal National Park
- Chadpai Wildlife Sanctuary
- Char Kukri-Mukri Wildlife Sanctuary
- Chunati Wildlife Sanctuary
- Dhangmari Wildlife Sanctuary
- Dudhmukhi Wildlife Sanctuary
- Dudpukuria-Dhopachari Wildlife Sanctuary
- Fasiakhali Wildlife Sanctuary
- Hazarikhil Wildlife Sanctuary
- Himchari National Park
- Inani National Park
- Kadigarh National Park
- Kaptai National Park
- Khadim Nagar National Park
- Kuakata Ecopark
- Lawachara National Park
- Madhupur National Park
- Madhutila Eco Park
- Marine Reserve
- Medhakachhapia National Park
- Mirpur Botanic Garden
- Nagarbari-Mohanganj Dolphin Sanctuary
- Nawabganj National Park
- Nazirganj Dolphin Sanctuary
- Nijhum Dwip National Park
- Pablakhali Wildlife Sanctuary
- Rajeshpur Eco-Park
- Ramsagar National Park
- Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary
- Sangu Wildlife Sanctuary
- Satchari National Park
- Shilanda-Nagdemra Dolphin Sanctuary
- Singra National Park

- Sitakunda Eco-Park
- Sonarchar Wildlife Sanctuary
- The Sundarbans
- St. Martin's Island Marine Protected Area
- Sundarbans East Wildlife Sanctuary
- Sundarbans South Wildlife Sanctuary
- Sundarbans West Wildlife Sanctuary
- Sundarbans Reserved Forest
- Swatch of No Ground Marine Protected Area
- Tanguar Haor
- Teknaf Game Reserve
- Tengragiri Wildlife Sanctuary
- Tilagor Eco Park

- **Community Engagement :** Involving local communities in conservation efforts fosters a sense of ownership and responsibility, contributing to the sustainable use of resources. In the last decade, Bangladesh has made rapid social and economic progress, but this has come at the cost of significant environmental damage. The World Bank and the Government of Bangladesh have been working together since 1980 to promote the sustainable use of the environment, natural resources, and the blue economy. The Bank is supporting the government to identify policies and investment options to consolidate the country's transition toward a green growth development pathway. following the 8th Five Year Plan, Delta Plan, Perspective Plan 2041 and the Mujib Climate Prosperity Plan.

- **Legislation and Policies:** The government has enacted laws and policies to regulate wildlife trade, habitat protection, and environmental impact assessments.

- **Awareness and Education:** Public awareness campaigns, environmental education programs, and community workshops raise consciousness about biodiversity's importance.

- **The Vision 2021** envisions environmentally sustainable development. In

addition to envisaging a resilient nation effectively tackling impacts of climate change and natural disasters, the Vision expresses Bangladesh's commitment to conserve and enhance its biodiversity. This commitment has been translated into Article 18 A of the Constitution of Bangladesh (2011); the Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012; the National Sustainable Development Strategy (2013); the 7th Five Year Plan (2015); and the National Conservation Strategy (draft 2016). As Bangladesh progresses fast towards becoming a middle-income country, we envisage changes in the ways she protects her biodiversity.

- **International Collaboration:** Bangladesh participates in global conservation agreements such as the Convention on Biological Diversity, collaborating with other nations to address transboundary biodiversity challenges.

6. Potential Solutions

- Sustainable Development: Integrating conservation considerations into development plans ensures that economic growth aligns with environmental protection.
- Habitat Restoration: Efforts to restore degraded habitats and establish wildlife corridors can reconnect fragmented ecosystems and promote species movement.
- Climate Resilience: Implementing climate adaptation strategies safeguards species from the impacts of climate change and enhances ecosystem resilience.
- Research and Monitoring: Continuous research on biodiversity dynamics and ecosystem health informs evidence-based conservation strategies.
- Capacity Building: Strengthening the capacities of governmental agencies, non-governmental organizations, and local communities enhances the effectiveness of conservation initiatives.

7. Conclusion

The conservation of biodiversity in Bangladesh is not just a matter of ecological significance but a comprehensive endeavor encompassing cultural, economic, and societal dimensions. With mounting challenges posed by habitat loss, overexploitation, pollution, invasive species, and climate change, urgent and concerted efforts are required. By embracing sustainable development, fostering community engagement, enacting effective policies, and nurturing awareness, Bangladesh can serve as a beacon of biodiversity conservation, preserving its natural heritage for generations to come. Through a harmonious balance between human progress and ecological preservation, Bangladesh can contribute to the global goal of safeguarding the diverse tapestry of life on Earth.

References:

1. Biodiversity in Bangladesh, SHARIF A. MUKUL, SHEKHAR R. BISWAS and Z. M. MANZOOR RASHID

2. Islam, M. M., Amin, A. S. M. R., & Sarker, S. K., (2003). National report on alien invasive species of Bangladesh. In: Invasive Alien Species in South-Southeast Asia: National Reports & Directory of Resources, Pallewatta, N., Reaser, J. K., & Gutierrez, A. T., (eds.). Global Invasive Species Programme (GISP). Cape Town (South Africa), pp. 7–24.

3. Mukul, S. A., Uddin, M. B., Rashid, A. Z. M. M., & Fox, J., (2010). Integrating livelihoods and conservation in protected areas: Understanding role and stakeholders' views on the prospects of non-timber forest products, A Bangladesh case study. International Journal of Sustainable Development and World Ecology

4. MoEF, (1993). Forestry Master Plan-Main Report, ADB (TA No. 1355-BAN), UNDP/ FAO/BGD 88/025. Ministry of Environment and Forest (MoEF), Dhaka

5. Wikipedia Online version

6. http://www.bbs.gov.bd/ (Bangladesh Bureau of Statistics)

স্বর্ণালী স্মৃতিতে ভরা প্রিয় কলেজ

এস. এম. মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

১৯৮১ সাল মোংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর! বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান সুন্দরবনের গা ঘেঁষে পশুর নদীর পাড়ে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলা। ১৯৫০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান মোংলা বন্দরের যাত্রা। পূর্ব নাম ছিল 'চালনা বন্দর' যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লোকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিলো এই বন্দর আর সে কারণে মিশ্র সংস্কৃতির এক নতুন জনপদ হয় মোংলা। শ্রমিকনির্ভর এই জনপদ তখনও শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হয়নি। বন্দরকে কেন্দ্র করে হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৯৮১ সালের পূর্বে তখনও কোনো কলেজ বা মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। তাই এই এলাকার এসএসসি পাশের পর বৃহৎ একটি শ্রেণির মানুষের লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটতো। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য জেলা সদরে রেখে সন্তানদের পড়াশোনা করানোর আর্থিক সংগতি খুব কম সংখ্যক পরিবারের ছিল। প্রাকৃতিকভাবেই লবণাক্ততা বেশি থাকায় ফসল উৎপাদন ছিল খুবই কষ্ট সাধ্য। এককথায় বলা যায় ফসল উৎপাদন হয় না বললেই চলে। সে কারণে এ এলাকার বেশিরভাগ মানুষ আর্থিকভাবে অসচ্ছল। জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকা মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা তখন গৌণ হয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অনুন্নত থাকায় তখন নৌপথই একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। জেলা সদর খুলনা ও বাগেরহাট মোংলা থেকে অনেক দূর হওয়ায় পড়াশুনা অনেকের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হতো। ১৯৫০ সালে মোংলা বন্দর সৃষ্টি হলেও উন্নয়ন তেমন হয়নি বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পার্শ্ববর্তী উপজেলায় কলেজ থাকলেও মোংলা থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেকের সেখানে থেকে পড়াশোনা করা সম্ভব হতো না।

ছবি-১

ছবি-২

ছবি– ৩

ছবি-১; ১৯৮১ সালে তৎকালীন যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এ কে মোহাম্মাদ উল্লাহ মোংলা কলেজ খোলার অনুমোদনের জন্য পরিদর্শনে আসেন। # ছবি-২; ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বোর্ড পরিদর্শনের অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা। # ছবি-৩-; বক্তব্যরত ডা: এস.এম.এ. সামাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সভাপতি, মোংলা বন্দর বণিক সমিতি।

মোংলার কৃতি সন্তান শিক্ষানুরাগী জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস যিনি তৎকালীন রামপাল উপজেলার অন্তর্গত গিলাতলায় অবস্থিত 'আবুল কালাম কলেজ' এ অধ্যাপনা করতেন, মোংলাপোর্ট পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাতেন, সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব ফ্রান্সিস সুদান হালদার, মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব নীরোদ বিহারি পোদ্দার-সহ আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যবসায়ী, সমাজসেবীর সহযোগিতায় ১৯৮১ সালে গড়ে তোলেন মোংলা কলেজ। আমি গর্বিত ও আনন্দিত এমন সুন্দর একটি মহৎকর্মে আমার পিতা ডা. এস এম এ সামাদ যুক্ত ছিলেন যিনি তৎকালীন মোংলা বন্দর বণিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। বণিক অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে কলেজ তৈরির কাজে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। আমি, আমার তিন সহোদর, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগনে, ভাগনি সহ পরিবারের অনেকেই এই প্রিয় কলেজে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

অনেক সোনালী স্মৃতিতে ভরা মোংলা কলেজ। হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে বাগেরহাট জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজে পরিণত হয়েছে আমাদের প্রিয় কলেজ। বর্তমানে কলেজটি সরকারি কলেজ।

প্রায় তিন যুগ পূর্বে ১৯৮৯ সালে কলেজের 'স্পোর্টস ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'য় অংশগ্রহণের আনন্দস্মৃতি আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা! জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হই। ১. বাংলা কবিতা আবৃত্তি ২. ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ও ৩. উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অর্জন করি। তিনটিতে প্রথম হওয়ায় চ্যাম্পিয়ন হই। ভাবতেই অবাক লাগে! স্পোর্টস ইভেন্টে তিনটায় পুরস্কার পেলেও একটি ইভেন্টে দ্বিতীয় হওয়ায় চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন অনেক আনন্দের স্মৃতিতে নস্টালজিক হয়ে পড়ি। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াকালীন প্রিয় বন্ধুদের সাথে আনন্দের স্মৃতি বিশেষ করে বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাসের স্মৃতি এখনো মনে আনন্দের দোলা দেয়।

একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি গর্বিত, আনন্দিত। কারণ ২০০৬ সালে প্রিয় কলেজে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। আমার প্রিয় শিক্ষকদের সাথে চাকরি করতে পেরে তাদের স্নেহভালবাসা লাভ করেছি। প্রিয় শিক্ষকদের স্নেহভালবাসায় সিক্ত ছিলাম। আমার সরাসরি শিক্ষক যাদের সাথে আমি চাকরি করার সুযোগ পেয়েছি আমার সেই সব শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী হলেন সুশীল কুমার সরকার (বাংলা), মৃনাল কান্তি শিকদার (রসায়ন), গাজী তৈয়াবুর রহমান (জীব বিজ্ঞান), নন্দ কিশোর অধিকারী (পদার্থ বিজ্ঞান), অজিত কুমার পাল (গণিত), বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (বাংলা),। বর্তমানে সকলেই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় শিক্ষক সুশীল কুমার সরকার আমাদের সকলকে ছেড়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। স্যারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কলেজে পড়াকালীন প্রিয় বন্ধুরা সকলেই নিয়মিত ক্লাস করতো এবং সে কারণে বন্ধুদের মধ্যে আন্তরিকতার দৃঢ়তা ছিল যা এখনো অটুট।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পরামর্শ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিলো আন্তরিকতায় ভরপুর যা বর্তমানে অনেকটাই অনুপস্থিত।

আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের প্রিয় মোংলা সরকারি কলেজ অচিরেই খুলনা বিভাগের তথা সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

আমি আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে গর্বিত, সম্মানিত ও আনন্দিত।

নতুন শিক্ষাক্রম ও মানসম্মত শিক্ষক

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক, সমাজকর্ম, মোংলা সরকারি কলেজ

বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চাই মানসম্মত যুগোপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানের নতুন এ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছেন এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ শিক্ষাক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শুধু জাতীয় মানের নয়, বিশ্বমানের মানব সম্পদ তৈরি করা। তবে নতুন এ শিক্ষাক্রম কতটুকু সফল হবে তা পুরোটাই নির্ভর করছে এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কর্মী বাহিনী অর্থাৎ দেশের শিক্ষক সমাজের উপর।

শিক্ষাক্রম যতই যুগোপযোগী আর মানসম্মত হোক না কেন, শিক্ষকগণ যদি চিন্তা-চেতনা ও দক্ষতায় যুগোপযোগী (Up-dated) আর মানসম্মত (Quality Teacher) না হন তাহলে এ মহতী কর্মযজ্ঞ সফলতার মুখ দেখার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ জন্য এ মানসম্মত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য চাই দক্ষতা সম্পন্ন মানসম্মত শিক্ষক। নতুন এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে আমি আমার লেখায় শিক্ষকতা পেশা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও মানসম্মত শিক্ষকের গুণাবলী সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোকপাত করতে চাই।

শিক্ষকতা পেশার ধারণা :

বর্তমানে শিক্ষকতা একটা পেশা। শিক্ষকরা শিক্ষকতা পেশায় চাকরি করেন। তারা সমাজে শিক্ষক হিসেবে পরিচিত, শিক্ষাগুরু হিসেবে নয়। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটলের যুগে শিক্ষকতা পেশা ছিল না। প্রাচীন চীনে কনফুসিয়াস, লাওৎসি বা মেনসিয়াম পেশাদার শিক্ষক ছিলেন না। সে সময়ে ভারতবর্ষেও শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহ ও টোলভিত্তিক। এঁরা কেউ-ই পেশাদার শিক্ষক ছিলেন না। তাঁরা সমাজে পরিচিত ছিলেন শিক্ষাগুরু নামে। তাঁরা ধর্ম, রাজ্য পরিচালনা ও যুদ্ধবিদ্যাসহ নানান বিষয়ে শুধু জ্ঞান দান-ই করতেন না, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য উত্তরসূরী শিষ্য তৈরি করতেন। সে যুগের গুরুগৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এতটাই উচ্চমার্গের ছিল যে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে চাণক্য পণ্ডিত বলেছিলেন,

"গুরু যদি এক বর্ণ শিষ্যেরে শিখায় একদিন
পৃথিবীতে নাই দ্রব্য যা দিয়ে শোধ দিবে ঋণ।"

মধ্যযুগে ইউরোপে যখন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে তখন থেকেই শিক্ষকতা নামের সূচনা হয়। গোলাম মুরশিদ বলেছেন, "শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে খানিকটা আত্মত্যাগ, জ্ঞানের সাধনা এবং ছাত্রদের শেখানোর আগ্রহ।" এ পেশায়ও অন্যান্য পেশার মত জীবিকানির্বাহের রসদ সংগ্রহের তাগিদ থাকলেও এ পেশার অন্য একটি অবৈষয়িক দিকও আছে, যা মুখ্য, গৌণ নয়। সেটা হলো ঐকান্তিকতা– নিবেদিত প্রাণ ঐকান্তিকতা। শিক্ষক মানব সভ্যতার অভিভাবক, সামাজিক প্রকৌশলী (Social Engineer)। স্যার জন এডামস্ বলেছেন, "শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর।" শিক্ষা হলো সভ্যতার রূপায়ণ, শিক্ষক হলেন সভ্যতার রূপকার। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল যথার্থই কলেছেন, "অন্য পেশাজীবীদের চাইতে শিক্ষকেরা হচ্ছেন সভ্যতার অধিকতর অগ্রগণ্য অভিভাবক।"

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক :

নতুন এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক একটা প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। নিছক ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হতে হবে অকৃত্রিম মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ। শিক্ষক যেমন তার শিক্ষার্থীকে সন্তানতুল্য ভালবাসবেন, স্নেহ করবেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও তার শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে।

নওগাঁর পতিসরের কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে (বাংলা ১৩৪৪ সাল ১৪ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ছাত্র-শিক্ষকদের সম্বন্ধ যেন অকৃত্রিম স্নেহের এবং ধৈর্য্যের দ্বারা সত্য ও মধুর হয়। ছাত্রদিগকে শাসন-পীড়নে অপমানিত করা অক্ষম ও কাপুরুষের ধর্ম। এ কথা সর্বদা মনে রাখিও।" তিনি আরো বলেন, "বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তি স্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তাহলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।" একজন শিক্ষক শুধু বিতরণ করেন না তার জ্ঞান, তিনি বিতরণ করেন অপার স্নেহ আর অসীম বিশ্বাস।

শিক্ষণ প্রক্রিয়া :

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English এ শিক্ষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "জ্ঞানের প্রসার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে পাঠদান, প্রশিক্ষণ এবং কোনো বিষয় জানার প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা।" এ সংজ্ঞানুযায়ী, শিক্ষা হলো একজন মানুষকে জ্ঞানী ও দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদে পরিণত করার একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের

আবার নানান পদ্ধতি রয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে শিখন পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ার কারণে শিখন ফলও ভিন্নতর হয়।

শিখন ফল (As Using Method)

ক্রমিক	শিখন পদ্ধতি	অর্জিত শিখন ফল (শতকরা হার)
১	Lecture	৫%
২	Reading	১০%
৩	Audio Visual	২০%
৪	Demonstration	৩০%
৫	Discussion	৫০%
৬	Practice by doing	৭৫%
৭	Immediate use of learning	৯০%

নতুন এ শিক্ষাক্রম উপরের টেবিলে বর্ণিত ৬ ও ৭নং শিখন পদ্ধতিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ পদ্ধতি দুটির সুবিধা হলো এ দুটিতে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং বিষয়টিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের সাথে সাথে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠে।

প্রবাদ আছে, 'যে রুটি ভালবাসা দিয়ে তৈরি না তা শুধু অর্ধেক ক্ষুধা মেটায়।' শিক্ষকরা যদি নতুন এ শিক্ষাক্রমকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলেই আমরা সুফল পাবো। Education International এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Mary Futrell বলেছেন, "যখন একজন শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি একজন শিক্ষকের উদার কৌশলের সংস্পর্শ লাভ করে তখন সেখানে আশ্চর্যজনক সুফল লাভ হয়।" আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কাজের প্রতি যদি ভালবাসা আর অন্তরের ছোঁয়া থাকে তবে সে কাজে সফলতা আসবেই।

মানসম্মত শিক্ষক :

'মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত মানসম্মত শিক্ষক'-এক দ্ব্যর্থহীন স্বীকার্য সত্য। কে মানসম্মত শিক্ষক? কী তার গুণাবলী? কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।" আমরা সবাই শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকলেও আমরা সকলে শিক্ষক নই, কেউ কেউ শিক্ষক। তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এর মতে, "A good teacher is like a candle- it consumes itself to light the way for others."

মানসম্মত শিক্ষকের গুণাবলী সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, "মানসম্পন্ন শিক্ষকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকা অপরিহার্য। সেগুলো হলো–

১) পেশাগত অঙ্গীকার
২) বিষয় জ্ঞান
৩) শিখন-শেখানো কলাকৌশলে দক্ষতা

এছাড়াও-

১) কথা বলার স্পষ্টতা
২) বাচনভঙ্গি
৩) গুছিয়ে ধারণা ব্যক্ত করার দক্ষতা
৪) ব্যক্তিত্ব

সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব অষ্ট্রেলিয়া (২০১০ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা শিক্ষকের সম্মাননা প্রাপ্ত) একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার মূলমন্ত্র কী সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "একজন শিক্ষক মানে আসলে আজীবনের ছাত্র। ভালো শিক্ষক হতে চাইলে আগে আজীবন ছাত্র হওয়া চাই।"

২৫/০১/২০১১ খ্রি. তারিখে মোংলা কলেজের ফাদার রিগন গ্রন্থাগারে 'মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক মত বিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং মোংলা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ফ্রান্সিস সুদান হালদার তাঁর বক্তব্যে শিক্ষকের জনারণ্য থেকে মানসম্মত শিক্ষক চিহ্নিত করার জন্য মানসম্মত শিক্ষকের কয়েকটি গুণাবলি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো–

১) সুশিক্ষক মানেই তিনি সুশিক্ষার্থী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।"

২) Teacher is a living example. একজন সুশিক্ষক মেধা, মনন, আচরণ, বচন ও বসনে হবেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

৩) শিক্ষক মানে প্রমিত মানুষ। (পরিচ্ছন্ন ভাষা, শুদ্ধ উচ্চারণ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, আচরণে-চলনে-বলনে-চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মানুষ।)

৪) সুশিক্ষক নিজে প্রাণিত এবং তিনি শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

৫) শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি হবেন তাদের মানবিক ও কল্যাণধর্মী কল্পনাশক্তির বাতিঘর স্বরূপ।

৬) সুশিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ববিদ।

৭) সুশিক্ষক হবেন সমাজ সচেতনতায় সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব, নানা রূপ ও মাত্রায়।

৮) সুশিক্ষক হবেন সংস্কৃতিমনা একজন মানুষ।

৯) সুশিক্ষক সমাজ সচেতন হবার সুবাদে রাজনীতি সচেতনও হবেন। তবে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করবেন না।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষক হবেন বিজ্ঞানমনষ্ক একজন মানুষ। বর্তমানে যেহেতু শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমসহ পেশাগত নানা কাজে কম্পিউটার ব্যবহার অপরিহার্য সেহেতু মানসম্মত শিক্ষকের কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অবশ্যই থাকতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার নতুন এ শিক্ষাক্রম চালু করেছেন। তাই এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে চাই জ্ঞানে-গুণে, চিন্তা-চেতনায় মানসম্মত স্মার্ট শিক্ষক।

বিদেশে শিক্ষকদের মান-মর্যাদা ও বেতন-ভাতাদি অনেক বেশি। এমনকি আমাদের বাংলাদেশ ছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলোতেও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা আনেক বেশি। এসব দেশে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতা পেশায় আসেন। বিদেশের শিক্ষকরা পর্যাপ্ত ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। আমাদের বাংলাদেশে এ চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এজন্য আমাদের দেশে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতা পেশায় আসেন না। তা সত্ত্বেও বিদেশের মত মানসম্মত শিক্ষক যে আমাদের দেশে নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা আর্থিক দীনতাসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। তাই নতুন এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে এবং বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত সেবার মান নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বেতন-ভাতাদিসহ সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষকরা আন্তরিক আছেন, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলে তাঁরা আরও আন্তরিক ও নিবেদিত হবেন এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পেশায় আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আশ্রয়

মমতাজ খানম
প্রভাষক ইংরেজি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

লোকটি দরজা খুলে উঠানে বেরিয়ে এল। সিগারেটের নেশা চেপেছে। অনেকদিন পর আজ পেটভরে সালেহার হাতের রান্না খেলো। হাই তুলে উঠানের শেষ মাথায় জলাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেটে টান দিতে দিতে আকাশের দিকে তাকালো। একটু একটু করে মেঘ জমছে। আবহাওয়াটাও কেমন যেন থমথমে। তার মনেও কাজ করছে মিশ্র অনুভূতি খুশি এবং উদ্বিগ্নতা। সালেহা অন্তঃসত্ত্বা। খেতে বসে মুচকি হেসে খবরটা জানাল সালেহা। হঠাৎ কপালে চিন্তার একটা ভাজ পড়ল। নজরে পড়ল পাশের চিকন রাস্তাটা ধরে কেউ একজন দৌড়ে আসছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানান দিল সমূহ বিপদ। একটু আড়াল করল নিজেকে। বিষয়টি ভাবতেই চিনতে পারল আগমনরত ব্যক্তিটিকে– তার চাচাত ভাই মতি।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল–
ভাইজান পালান, ওরা আইশা পড়ছে।
তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভিতরে সালেহা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমাচ্ছে। মতিকে বলল–

আম্মা আর তোর ভাবীরে ক সাবধান থাকতি। বলেই দিল দৌড়।

বাগান আর দুইটা বাড়ি ডিঙিয়ে সামনেই তার চাচাত দাদার বাড়ি। বাড়িটি অনিরাপদ হলেও এখানেই তার আশ্রয় নিতে হবে। একটু ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। কারণ এরপরে বাগান পেরিয়ে খোলা মাঠ। আর এটাতে ওদেরকে ধোঁকাও দেওয়া সহজ হবে। কিন্তু দরকার বিশ্বস্ত একজন আশ্রয়দাতার।

ঘরের সামনেই দেখতে পেল ভাবীকে।
ভাবী ওরা পিছনে!

ভিতরে আস। ভাবী একথা বলে ভিতরের ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। সিগারেটটার দিকে ইংগিত করে বলল-ওইডা আমারে দাও। এরপর চাচ দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়ে ঘরের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুকতে লাগল। হঠাৎ কয়েকজনের একটা দল বাড়ির ভিতর ঢুকল। তাদেরকে দেখিয়েই সিগারেটটা বন্ধ করল। কারণ যদি সিগারেটের গন্ধ পেয়েই থাকে-তাহলে সে নিজে খাচ্ছিল সেটা বোঝানোর জন্য।

ওই নূরজাহান মকবুলরে দেখছি এইদিকে দৌড় দিছে। তার ভাসুর তাকে বলল। সংগে আছে তার চাচা শ্বশুর, বাড়ির আরো দু'জন আর দু'জন মিলিটারি।

শোনেন-ঘরের মধ্যি ছোট ছোট ছেলেপেলে আছে। এরম শোরগোল করলি ওরা ভয় পাবে। এই বাড়ি আশ্রয় নেয়ার মত বোকামি মকবুল করবেনা। তয় আমি একজনের দৌড়াইয়া যাবার আওয়াজ শুনছি। বাইরি আইসা দেখতে চাইছিলাম কেডা, কিন্তু দেখতি পারি নেই।

কয়েকজন ঢুকল বাগানের দিকে, দু'জন গেল রাস্তা ধরে। না পেয়ে ফিরে এল সবাই। ক্রোধে ফেটে পড়ল। এত হাতে নাগালে পেয়েও অবশেষে হারাতে হল। কেউ একজন বলল-ওর বাড়িই আজকে জ্বালাই দিই।

ও কাজ কইরো না। আরেকজন বলল-শুনছি মকবুল বলছে-আমার ঘরের কিছু ওইলে মাধবকাঠির একটা বাড়িও আস্ত থাকপে না।

এত বড় কতা। দেহি ও কি করে। সবাই গেল লোকটির বাড়ি। সালেহা কম বয়সী, রূপসী। আয়শা চৌধুরী লোকটির মা এখন আর কেউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। বাচ্চা দুটিকে তার কাছে রেখে আগেই সরিয়ে দিয়েছে সালেহাকে বাড়ির পিছনের একটা জায়গায়।

সবাই দলবলে এসে লোকটির মুদি ব্যবসার জিনিসপত্র চালের বস্তা, তেলের টিন, ডাল-সব টেনে হিঁচড়ে বার করতে লাগল। আয়শা চৌধুরী নীরব রইলেন। সব নিজেদের চেনা পরিচিত লোকজন এই কাজগুলি করছে। তার চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ভয় শুধু সালেহাকে নিয়ে। আর মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন ছেলেটা যেন বেঁচে থাকে।

লোকটি আমার আব্বা। মোঃ মকবুল হোসেন। ১৯৭১ সালের ৯ নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম (অবঃ) এর অধীন যুদ্ধকালীন কমান্ডার কাজী আমজাদুল হক এর অধীনস্ত একজন যোদ্ধা। একজন সৎ, কর্মঠ, দায়িত্ববান ব্যক্তি। শৈশবে বাবাকে হারিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে বেড়ে উঠেছেন। লেখাপড়াও সেভাবে করতে পারেননি। তাই স্বপ্ন দেখেছিলেন নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করার, প্রকৃত মানুষ করার। আমাদের বলতেন-প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা সবই হবে বই-এর সাথে। এটাই থাকবে তোমার সাথে সব সময়। সিগারেটের নেশা ছিল। সন্তানরা তার দেখাদেখি আসক্ত হয়ে পড়বে ভেবে আমার ভাইয়েরা বড় হয়ে ওঠার আগেই সেই নেশা ত্যাগ করেছেন। মেয়েদেরকে একটু বেশিই ভালবাসতেন। হয়তো সব বাবাই তাই করেন। অনেক আমোদ প্রমোদ করতে পছন্দ করতেন। আমাদের সবাইকে নিয়ে বিশ্বকাপ খেলা দেখতেন। সেটি ক্রিকেট হোক বা ফুটবল। তবে ফুটবলটা একটু বেশিই পছন্দ করেছেন। আমাদেরকে মাঝে মাঝে হলে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন।

যে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এরকম বিপদে তাকে কয়েকবারই পড়তে হয়েছে। তবে আমরা সব সময় সেই মহিলার কাছে কৃতজ্ঞ। চাইলেই ধরিয়ে দিতে পারতেন সেদিন। ওনার চোখের ইশারাই যথেষ্ট

ছিল। আর কৃতজ্ঞ আমার মতি চাচার কাছে। আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম আব্বা যদি ওই সময় মারা যেতেন, তাহলে আমি কার ঘরে জন্ম নিতাম।

আব্বা এখন আর এই পৃথিবীতে নেই। আমি সন্তানের জননী হতে চলেছি সংবাদটি জানার কিছুদির পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আব্বার শূন্যতা বোধ করে সব সময়। বিশেষ করে যখন কোন সমস্যায় অসহায় বোধ করি, ভাবি আব্বা থাকলে বোধ হয় এমনটি হোত না। তবুও ভেঙে পড়ি না। তার কাছ থেকেই পেয়েছি সেই অনুপ্রেরণা। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আব্বাকে জান্নাত দান করেন। আর মনে মনে আব্বাকে বলি-আব্বা আপনার স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করছি। চেষ্ট করছি-'মানুষ হওয়ার'।

নারী বিপ্লবী ও প্রীতিলতা

প্রমীলা রায়
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

মানব সভ্যতার ইতিহাস এক ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে মানুষকে তার ন্যায্য প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে বারবার। আন্দোলনে অর্জনও যেমন ব্যর্থতাও কম নয়। আর এ সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অংশগ্রহণ করেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। নারীকে তার ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে।

ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে অনেক মহিয়সী নারীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব গাথা। চিতোরের রানি পদ্মীনি (১৩০৩) অসাধারণ বুদ্ধিমতী, যার আহ্বানে অন্যান্য রাজপুত রমণীগণ একত্রিত হয়ে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজীর ঘৃণ্য লালসার কাছে আত্মসমর্পণ না করে (জহর ব্রত) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়েছিলেন। স্থাপন করেছিলেন এক অতুলনীয় কীর্তি। এ মৃত্যু আত্মহনন নয় যথার্থ বীরের মতনই যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক চিত্তে মত্যুবরণ। দেশপ্রেমের আর এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন দাক্ষিণাত্যের আহমদনগর রাজ্যের স্বাধীন সুলতান হুসাইন নিজাম শাহ (১৫৫৩-৬৫) এর কন্যা চাঁদ সুলতানা বা চাঁদবিবি। বৈবাহিক সূত্রে তিনি ছিলেন বিজাপুরের স্বাধীন শাসক প্রথম আলী আদিল শাহের পত্নী। আদিল শাহের সময়কাল ১৫৫৮-১৫৮০ খ্রি.। চাঁদবিবি অশ্বারোহণ, যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। শাসনকার্য পরিচালনা ও কয়েকটি যুদ্ধে তিনি স্বামীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। ১৫৯৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় বার ১৫৯৯ সালের যুদ্ধে সেনাপতি হামিদ খানের কুচক্রে তিনি নিহত হন।

অষ্টাদশ শতকের আরেক মহিয়সী রাণী ভারতের মারাঠা মালওয়া রাজ্যের হোলকর রাণী রাজমাতা অহল্যাবাঈ। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন রাজনৈতিক কৌশলী, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। অন্যদিকে অনাসক্ত ও প্রজাবৎসল ছিলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক বড়লাট লর্ড ডালহৌসির (১৮৪৮-১৮৫৬) সিদ্ধান্ত ঝাঁসী বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। তিনি ভারতীয় রাজ্যগুলি দখলের জন্য স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রচলন করেন। এই নীতির বলে অপুত্রক রাজাদের রাজ্যগুলি ইংরেজ সরকারের অধিকারে চলে যেত। রানি লক্ষ্মীবাঈ এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে রানি

বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিন দিন সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখেন। শেষে এক সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসী দখল করে। রানি পুরুষ বেশে সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তার বীরত্ব দেশবাসীকে অভিভূত করেছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে দুজন বিদেশী মহিলা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তারা হলেন আয়ারল্যান্ড দুহিতা মার্গারেট নোবেল (১৮৬৭-১৯১১) যিনি সিস্টার নিবেদিতা নামে পরিচিত। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি দেশবাসীকে সহযোগিতা করেছিলেন। অন্যজন চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী নেলী সেনগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭৩)। নেলী সেনগুপ্ত ছিলেন জন্মসূত্রে ইংল্যান্ডের অধিবাসী। দেশ মাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ইতিহাসে অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় মেয়েদের শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে নেয়ার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে মা, বোন, বৌদি, স্ত্রী ছদ্মবেশে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে। আবার ফেরারি কর্মীদের গোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা, চিঠি আদান-প্রদান করা, এসব কাজ তারা করেছেন। বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনেক নারী পুশিলের নির্যাতন সহ্য করেছেন আবার জেলও খেটেছেন। ননী বালা, দুকড়ি বালা, সাবিত্রীদেবী, কুন্দ প্রভা সেন, লীলা নাগ সহ আরও অনেক দেশপ্রেমিক নারীর সাহসিকতার কথা জানা যায়।

মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বৃটিশ অপশাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যে মহিয়সী নারী দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তিনি চট্টল গৌরব প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১- ১৯৩২)। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির ইতিহাসে প্রথম শহীদ কন্যা হিসাবে তাঁর নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। তাঁর এ আত্মাহুতি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণে প্রেরণা যুগিয়েছে। আবার অনুপ্রাণিত করেছে বর্তমান নারী সমাজকে। প্রীতিলতা উদ্দীপিত হয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের ঘোড়ার পিঠে বসা তরবারি হাতে ছবি দেখে।

শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। চট্টগ্রামে ধলঘাটে তাঁর জন্ম। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামের বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় ডাঃ খাস্তগীর স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী প্রীতিলতা শুনলেন এক উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ। রেলকারখানার শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য টাকা নিয়ে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। চারজন পিস্তলধারী ব্যক্তি এ টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং বন্দুকধারী দুজন পুলিশকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য ওরা বোমা বানায়, বোমা রাখে, পিস্তল রাখে সাথে।

ওরা মৃত্যুকে ভয় করে না। জানা গেল এ দুজন সাহসী ব্যক্তি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এদের একজন উমাতারা স্কুলের শিক্ষক সূর্যসেন, অন্যজন অম্বিকা চক্রবর্তী। স্বদেশের মাটির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ঝাঁসির রানির সংকল্পের মত চট্টল রানিও (প্রীতিলতার ডাক নাম রানি) প্রাণ দিতে সংকল্পবদ্ধ হলেন।

চট্টগ্রাম কোর্টে রেলওয়ে ডাকাতির মামলা চলছে। তুমুল হৈচৈ। সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন চট্টগ্রামের আরেক কৃতি সন্তান ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ব্যারিস্টারের যুক্তি-তর্কে শেষ পর্যন্ত সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী মুক্তি পেলেন। প্রীতিলতা জানতে পারলেন যারা স্বাধীনতাকামী, বৃটিশদের চোখে তারা ডাকাত। চট্টগ্রাম যুগান্তর দলের নেতৃত্বে ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। প্রীতিলতা বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চান। সে সুযোগ এলো ১৯২৮ সালে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তির পর। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগের নেতৃত্বে পরিচালিত 'দীপালি সংঘ' এর সদস্য হলেন। তখন বিপ্লবীদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ইংরেজদের হাত থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। ১৯৩০ সালে প্রীতিলতা ঢাকা বোর্ডে ১ম স্থান অধিকার করে আইএ পাশ করেন। এরপর কলকাতার বেথুন কলেজে দর্শন শাস্ত্রে ভর্তি হন।

সেখানে মাস্টারদার নির্দেশে গড়ে তোলেন বিপ্লবী দল। এসময় প্রীতিলতা কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত বিপ্লবীদের পাঠাতেন। কলকাতা থেকে বোমা তৈরির খোল এনে প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েরা চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতো। এভাবে ধীরে ধীরে প্রীতিলতা প্রকাশ্যে বিপ্লবী দলে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রীতিলতার ছাত্রীনিবাসে কলকাতার বিশিষ্ট দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকার এক সন্ধ্যাকালীন বিশেষ সংখ্যার শিরোনামের মাধ্যমে জানতে পারেন, 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস, রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার, "এ অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থান নিয়ে বিপ্লবী দল বৃটিশ বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ১২ জন শহীদ হন। বিপ্লবীদের জালালাবাদ সংঘর্ষের পর মাস্টারদা সূর্যসেনের পরিচালনায় চট্টগ্রামে আরও সংঘর্ষের প্রয়োজনে গোপনে বোমা তৈরির কাজ চলছিল। বোমা তৈরির জন্য অত্যন্ত জরুরী এক অংশ "গান-কটন" তৈরিতে বিপ্লবীরা ব্যর্থ হচ্ছিল। গান-কটন তৈরি হতো কলকাতার এক ঔষধ তৈরির কারখানায়। এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রীতিলতাকে। অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রথমে নিজের হাতের চুড়ি ও গলার হার দিয়ে দেন। তারপর অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে অলংকার সংগ্রহ করতে থাকেন। গান- কটন তৈরির দায়িত্ব সাধারণত বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হতো। প্রীতিলতা বিজ্ঞানের ছাত্রী না হয়েও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনায়াসে প্রক্রিয়াটি আয়ত্তে আনেন। এ 'গান-কটন' এর কার্যকারিতা দেখে মাস্টারদা খুব প্রশংসা করেন। এ সময় বিপ্লবীরা ইংরেজ পুলিশ ডি আই জি মি. ক্রেগকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এ দায়িত্বে ছিলেন দুই সাহসী বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। কিন্তু ভুল ক্রমে বাঙালি পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীর গায়ে লাগে এবং নিহত হন। পুলিশের হাতে বিপ্লবীদ্বয় ধরা পড়েন এবং তাদের ফাঁসির আদেশ হয়। মাস্টারদার কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় দলের নির্দেশ ছাড়া কোন মেয়ে অন্য ছেলে সদস্যের সাথে দেখা করতে পারবে না। তবু প্রীতিলতা বোনের পরিচয় দিয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে চল্লিশবার দেখা করেন। পরে মাস্টারদা ও অন্যান্য বিপ্লবীরা এ

খবর জেনেছিলেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুতে প্রীতিলতা লিখলেন, ‘এ মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পূর্ণ করে দিতে প্রভূত সাহায্য করেছে।’ দেশ পুড়ছে, কঠিন শৃংখলিত স্বদেশ, সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছে দেশভক্ত সন্তানেরা। এমন সময়ে প্রীতিলতার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা মূল্যহীন। কিন্তু অনুপ্রেরণার শক্তি উষাদির কথায় ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ফিরে আসেন চট্টগ্রামে এবং নন্দনকাননস্থ অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন।

দীর্ঘদিন থেকে প্রীতিলতা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশগ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন পুলিশ খবর পেয়ে বাড়ি ঘেরাও করে। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা ঘর থেকে বের হয়ে পাশের একটি ময়লা ভরা পুকুরে নেমে অনেকক্ষণ নিজেদের লুকিয়ে রাখেন এবং গোপন কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নেন। দুদিক থেকে চলতে লাগল প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিচে পড়ে যান। ঘটনায় বিপ্লবী নির্মল সেন এবং অপূর্ব সেন নিহত হলেন। এ সময় প্রীতিলতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরে মাস্টারদা তাকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন।

১৯৩০ সালের **১৮**ই এপ্রিল চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ঐদিন গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে ক্লাব বন্ধ থাকায় এ কর্মসূচি বাতিল হয়।

১৯৩২ সালের **২৩**শে সেপ্টেম্বর রাতে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ দায়িত্ব মাস্টারদা প্রীতিলতাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিশ্চিত জীবন উপেক্ষা করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রীতিলতা মনে মনে শপথ নিলেন এ অভিযানে তাকে সফল হতে হবে। প্রীতিলতা সেনাপতি, তাঁর সহযোদ্ধা পাঁচ জন। ক্লাবের বাবুর্চির সংকেত পাওয়া মাত্র শুরু হলো গুলিবর্ষণ, বোমা নিক্ষেপ। মুহূর্তে থেমে গেলো উন্মত্ত বল নাচ, শুরু হলো চিৎকার। তাও আবার বোমা নিক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেল। অভিযান সফল হলো। সবাই এগিয়ে যাচ্ছেন নেতা পিছনে, হঠাৎ একটি গুলি লাগল তাঁর বুকে। ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিয়ে প্রাণ দিলেন চট্টল রাণি প্রীতিলতা। সেই যুগের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা রেখে গেলেন দেশপ্রেমের আদর্শ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

তথ্য সূত্র :

বীর কন্যা প্রীতিলতা– পূর্ণেন্দু দস্তিদার

বীর কন্যা প্রীতিলতা– পংকজ চক্রবর্তী

শিক্ষা নৈতিক চেতনা না কি জীবিকা

নিগার সুলতানা সুমী
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

Education ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো "The act of training"। বাংলা মত অনুযায়ী শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় শিশু বা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন উপযোগী কিছু কৌশল আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন-শিক্ষার উদেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশ।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিলো আত্ম-উপলব্ধি আর আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে সুনাগরিক করে গড়ে তোলা। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার ও পরিবর্তন ঘটে। আজকাল স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন স্থানে জ্ঞান আহরণের বদলে প্রতিযোগিতার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। যে প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীর থেকে অবিভাবকের অংশগ্রহণটা বেশি লক্ষ্য করা যায়, তাদের হিংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব পড়ছে শিশুর মানসিকতায়। যেখানে একটি শিশুকে জ্ঞান অর্জনের মত পড়ার বদলে বলা হয় A+ পাওয়ার জন্য পড়তে সেখান চেতনার বিকাশ বিলুপ্ত। একজন শিক্ষার্থী ৯ম-১০ম শ্রেণিতে যখন পড়ে তখন থেকেই তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় পড়াশুনা করতে হবে টাকা ইনকামের জন্য। যার ফলে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ হলে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয় ভর্তি প্রতিযোগিতায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শেষে চাকরি পাওয়া তথা বিসিএস এবং তারই মতন বিভিন্ন পরীক্ষার যুদ্ধে। আমাদের দেশে পড়াশুনা শেষ করতে সময় লাগে গড়ে ১৮ বছর (SSC প্রায় ১১ বছর + HSC ২ বছর + অনার্স ৪ বছর + মাস্টার্স ১ বছর)। এইখানেই শেষ নয় এরপর ভালো একটা চাকরি পেতে আরো ২/৩ বছর। এভাবেই কেটে যায় ২০/২১ টা বছর; কিন্তু তারপরও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অনেকে পদার্পণ করে বেকারত্ব নামক নতুন জীবনে। আর তখনই তাদের শুনতে হয় সমাজের হাজারো কটুকথা। যার ফলে সমাজের একটা বড় অংশের যুব সমাজ হতাশায় পতিত হয় এবং সমাজে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলার সাথে নানা অপকর্ম। অন্য দিকে দেখা যাবে কোনো ব্যক্তি যদি একটি ব্যবসা নিয়ে ২০ বছর সময় পার করতো তবে ব্যবসাটি হয়তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং বেকারত্ব নিয়ে হতাশ হতে হতো না। বর্হিবিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ছাত্র জীবন থেকে তারা কোনো একটা কর্মের সাথে জড়িত, হোক তা অল্প আয়ের উৎস। দেশের একটা সন্তান যদি ২৫ বছরই কেবল জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ব্যয় করে তবে অবশ্যই কর্মময় জীবনের সময় পরিধি কমতে থাকবে। পক্ষান্তরে যদি প্রতিযোগিতায় না নেমে সত্যি জ্ঞান অর্জনের জন্য সময়

ব্যয় করতো তবে তা অবশ্যই ব্যক্তি অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধন করতো। রবীন্দ্রনাথের মতে -তাকেই বলি শ্রেষ্ট শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।

আমার ব্যক্তি জীবনে ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত থাকার সময়ে আমি বুটিক্স কাজ, বেকারি ফুড, পটারীর কাজ, সিরামিকের শোপিসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম এবং ছাত্র জীবনে কোনো না কোনো একটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং আয়ও খারাপ হতো না। যার ফলে চাকুরী জীবনে পদার্পণ করার পূর্বে আমি নিজেকে বেকারত্ব থেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম। হাতে কলমে কাজের প্রশিক্ষণগুলো আমার আত্মবিশ্বাসকে অটুট রাখতে সহায়তা করেছে। বেকারত্ব শুধু চাকুরীহীন নয়, কর্মহীনও বটে। চিনের প্রতিটি ঘরে ঘরে সকল বয়সের মানুষ উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত। বিশ্ব বাজারের বড় একটা অংশ আজ চিনাদের দখলে কারণ জীবনকে তারা কর্মমুখর করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে আমাদের যুব সমাজ টিকটক উৎপাদনে জীবনকে করছে রঙিন।

ছাত্র জীবন থেকেই যদি ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট উৎপাদনমূলক, শিক্ষামূলক কন্টেন্ট তৈরি, কৃষি গবেষণামূলক কাজ এবং তথ্য প্রযুক্তির সাথে যুক্ত থাকে তবে পড়াশুনা শেষ হবার সাথে সাথে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। যার ফলস্বরূপ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতো এবং তথাকথিত শিক্ষানীতির অবসান হতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য হোক মানসিক শক্তিকে বাইরে আনা, যা প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র। বড় ডিগ্রি, বড় চাকুরী, মোটা অংকের ঘুষ, বিরাট দুর্নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য না হোক। শিক্ষা যেনো হয় নতুন আবিষ্কারের নেশা, মাদকের নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে শিক্ষা জীবিকার নয়, চেতনাবোধ জাগ্রতের হাতিয়ার।

সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

নোনাভূমির সুন্দরী গাছ বা সমুদ্র-বনের অপভ্রংশে 'সুন্দরবন'। প্রাচীনকালে বলা হত 'আঙ্গেরীয়' বন। যুগের পালা বদলে কবে সেটা সুন্দরবন হল, ঠিক বলা যায় না। গবেষকেরা প্রায়শই বলে থাকেন সুন্দরী গাছের নাম থেকেই এ বনের নাম সুন্দরবন। অরণ্য আর নদী পাশাপাশি। এ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করেছে জল। নোনাজল। লেখকদের বর্ণনায় কেউ বলছেন, জিলাপির প্যাঁচের মতো, আবার কেউ বলছেন মাকড়সার জালের মত সরু-মোটা সরীসৃপ সদৃশ নদী খাড়ি বেয়ে নোনাজল জনপদ অরণ্য ঘুরে শেষে সমুদ্রে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা পূর্ব সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর। এর তটভূমিতে কোথাও বন কোথাও গ্রাম। সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় আন্দোলিত সুন্দরবনের দ্বীপগুলি মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মানচিত্রে যেন একটি বড় নারকেল পাতার বর্ণালি আল্পনা। এই রহস্যময় অরণ্য, এর গাছ-গাছালি, জল ও স্থলের বিচিত্র জীবজগৎ, দেবদেবী, মানুষের আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার এবং বিস্তৃত জনরাজ্যকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সুন্দরবনভিত্তিক সাহিত্য সম্ভার। আমাদের আলোচ্য বিষয় সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধ।

ভৌগোলিক সীমারেখায় সুন্দরবনকে ভারত বাংলাদেশ দুই অংশে ভাগ করলেও সাহিত্যে সুন্দরবনের দেশকালে বা কাটা তারের সীমানা নেই। দুই দেশের মানচিত্রে যে সুন্দরবন দেখা যায় তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, লোকগাথা, গ্রাম্য লোকাচার, সংগীত রচনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল সাহিত্যে উঠে এসেছে সহজ সরল মানুষের অতি সহজিয়া মানবিক জীবনালেখ্য। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের অগণিত কবি সুন্দরবনের রূপমাধুরী ও জেলে,বাওয়ালি, মৌয়াল, কাঠুরিয়া সহ বনজীবীদের নিয়ে এবং সুন্দরবনের হিংস্র জীবজন্তু নিয়ে অসাধারণ কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। তাদের নিজস্ব দর্পণে ধরা পড়েছে সমকালীন মানুষের মানবিক ও অমানবিক রসবোধের কবিতা। প্রতিফলিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন কাব্য সাহিত্য।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের গল্প ধরা পড়েছে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতিতে। চর্যা ৮ এর এক পর্যায় কলম্বপাদ বলছেন–

খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি।

মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ,
কেড়ুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবক পারঅ। (৬)

আধুনিক অর্থে, খুঁটি উপড়িয়ে কাছি মেলে কলম্বপাদ তুমি সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে নৌকা বেয়ে মাঝ নদীতে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখ। দাঁড় না থাকলে কে নৌকা বাইতে পারে?

অথবা "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী
বেঙ্গ সংসার মোর বাড়হিয়া যায়"। (৬)

হাড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথির আগমনে উৎকণ্ঠিত গৃহস্থ। যার সংসার ব্যাঙের মতো বেড়েই যাচ্ছে। সে যুগের মানুষ নৌকা বেয়ে, মাছ ধরে পশুপাখি শিকার করে মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। এখনকার মত মানুষের জীবনের আয় রোজগারের পথটা এত সহজ ছিল না। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কবি কঙ্কণ মুকন্দরাম চক্রবর্তীর 'কালকেতু উপাখ্যান' এ বনজীবী কালকেতুর মাধ্যমে পূজা প্রচার করতে গিয়ে জঙ্গলের পশুপাখিদের নিয়ে তিনি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। অবশেষে সাতঘড়া ধন দিয়ে বন কেটে নগর প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন এ কাব্যে। মানব বসতির জন্য জঙ্গল কাটা এই আমানবিক চিত্র সেখানেও রয়েছে। দেবী যখন গোধীকার ছদ্মবেশে কালকেতুর ধনুকের সাথে বাঁধা পড়ে তার বাড়িতে আসেন, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে দেবীর সাথে ফুল্লরার ক্লাইমেক্স ভাবনার প্রতিফলন। দেবী নিজস্ব মূর্তিতে আবির্ভূত হলে ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে কালকেতুকে তিরস্কার করে বলে–

"পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে
কাহার যোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে?"। (৮)

মধ্যযুগের আরেকজন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকারের "অন্নদা মঙ্গল" কাব্যের কবিতায় মধ্যবিত্ত বাঙালির নৈমিত্তিক অতি সাধারণ অথচ মর্মান্তিক আবেদনের চিরন্তন চিত্র ফুটে উঠেছে। নদী পার করে দিয়ে, দেবীর পরিচয় জানতে পেয়ে পাটুনি দেবীর কাছে বর চেয়েছে–

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" (৮)

বর্তমান সময়েও এই অতি সামান্য চাওয়া পাওয়া মেটাতে মানুষ অমানুষিক পরিশ্রম করেও হিমশিম খাচ্ছে।

সুন্দরবনের সন্নিকটে বাড়ি কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র। তাঁর অধিকাংশ লেখা শহর কেন্দ্রিক হলেও সুন্দরবনের গাছ-গাছালি, নদ নদী ও বাদাবন নিয়েও বেশকিছু কবিতা লিখেছেন 'গাছ গাছালির গল্প' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

"শেষ হয়ে এল পাতা ঝরানোর দিন,
দ্বিধার পুরোনো বল্কল গেছে খসে-।

এখন তোমার শাখায় নতুন পাতা
ফুটবে যেমন তারা ফোটে আসমানে।

.....

গাছ গাছালির গেরুয়া গৃহস্থালি
রয়েছে পেছনে, এখন তুমি তো তরু-।"

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র "গহীন গাঙের জল" কবিতায় সুন্দরবন উপকূলবাসীর ঝড় তুফানে নোনাজলের তীব্র দহন ও কঠিন বাস্তবতার রূপ ফুটে উঠেছে আধুনিক উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে–

"গহিন গাঙের ঘোলা নোনাজল উথালি পাথালি নাচে
ফনা তুলে আসে তুফানের সাপ কাফনের মতো শাদা।
পরানের পরে পড়ে আছড়ায়ে বিশাল জলের ক্রোধ-
যেনো উপকূল ভিটে মাটি ঘর টেনে নিয়ে যাবে ছিড়ে।

.....

রোদ্দুরে পোড়া জ্যোৎস্নায় ভেজা প্লাবনে ভাষানো মাটি,
চারিপাশে তার রুক্ষ হা-মুখো হাভাতে হাঙর জল।"

ব্রিটিশ রাজকবি টেড এর সুন্দরবন কেন্দ্রিক কবিতা হরিণ সম্ভব স্বপ্ন-এর আংশিক এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি যোগ্য–

"এখানে আমি পার করেছি ছেঁড়াখোঁড়া
স্বপ্নের রাত।
ডাক বাংলোর সীমানায় স্বপ্নগুলোকে ধরে
রাখতে পারিনি আমি
ওরা ছড়িয়ে গেছে, অরণ্য জুড়ে
ওদের মাড়িয়ে গেছে একদল বাঘ।
ভোরের সাগর
গোলাপের রাঙা পাপড়ির এক শয্যা
কে এক অপরূপা ঘুমিয়েছে ওখানে
নিখুঁত এক ঘুম।" (হিরনপয়েন্ট, বুধবার, ২২নভেম্বর ১৯৮৯) (৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পরিমাণে সাহিত্য রচনা করেছেন সে তুলনায় সুন্দরবনকে নিয়ে লিখেছেন অতি সামান্য। এর উত্তরে তিনি বলেছেন "আমি যে ওদের ভাষা জানি না, না হলে আমি লিখতাম।" (৫) তাঁর একটি কবিতায় সুন্দরবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন–

"হোথায় গহন গভীর বন

তীরে নাহি লোকজন
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোঁপে ঝাপে
ঘাড়ে পড়ি আসে একলাফে।" (২)

অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার ভৌমিকের "সুন্দরবন" কবিতাটি সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্যের মানবিক মূল্যায়নের যথার্থ কবিতা–

"বদর বদর!
বাওয়ালির ডিঙ্গি ভাসে মৌয়ালের সাথে পশুর গর্জন
পালিত সন্তান আসে রূপসার ঘাটে। আসে গোলপাতা
বুকে নিয়ে বসতির সুখের আস্বাদ।
গাজী! গাজী- উচ্চস্বরে
এখানেও আমি আছি কাঠফাটা শ্রমিকের ঘামে,
আমি আছি ডিঙ্গি-বাওয়া মাঝিদের হালে,
নদীতে-সমুদ্রে আছি জলের সংগ্রামী,
জলে কি ডাঙায়, বনে আছি জন্মান্তরে।
বন থেকে ফেরে না যে লড়াকু মানব
তার বিধবার শুভ্র শুকানো সিঁথিতে আছি নিরন্তর!
ঘাটে ঘাটে ভেসে যাওয়া ভাটিয়ালি সুরে উজান-ভাঁটাতে
আমি আছি খুল্লনার অরণ্য আলয়ে।" (২)

সুন্দরবন এবং বন সংশ্লিষ্ট মানুষ ও জীবজন্তুর মানবিক বীক্ষণ এ কবিতাটি। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার আংশিক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য–

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাচিয়া আছি,
আমরা হেলায় খেলাই, নাগের মাথায় নাচি।"

কবি জীবনানন্দ দাসের "সুন্দরবনের গল্প" কবিতাতেও সুন্দরবনের ভয়ংকর জীবজন্তুর আখ্যান উঠে এসেছে–

"ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো।
কাল সারারাত বাঘিনী ছিল তার পিছু পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দর চিতাবাঘিনী
এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে–"

নাগরিক কবি শামসুর রাহমান বনের হিরণ পয়েন্টে এসে উপভোগ করেছেন সুন্দরবনের নান্দনিক সৌন্দর্য–

"বনের ভেতরে প্রকৃতই বাঘ ছিল, ছিল কিছু
ভিন্ন পশু, পাখি, হায়, শুধু বাঘের পায়ের ছাপ
দেখেই ফিরতে হল,অথচ শুনিনি তার ডাক,
.....
সুন্দর বনের শোভা দেখেছি নিকট আর দূর থেকে"। (২)

এমন দৃষ্টান্ত হাজারো কবির হৃদয়ে দাগ কেটেছে নান্দনিক সুন্দরবন ও পারিপার্শ্বিক জগৎ। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন অজস্র কবিতা খেলা করেছে কবিদের কবিতার খাতায়। কবি জসীম উদদীনের মানবিক কবিতা সুন্দরবন, তপন বাগচির সুন্দর বলেই সুন্দরবন, ত্রিদিব দস্তিদারের কবিতা-বাঘ-দুধে মায়ের গল্প, নাজিম শাহরিয়ারের পশুর নদীর জন্য পঙ্‌ক্তি, রফিক আজাদের তোমাকে কাছে পেয়ে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর বাঘ, হাসান হাফিজের হায় সুন্দরবন! এছাড়াও অসংখ্য গুণী কবি সুন্দরবন নিয়ে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন কবিতা লিখেছেন এবং অসংখ্য তরুণ কবি লিখে চলেছেন। (৩)

বাসুদেব বিশ্বাস বাবলার একটি অসামান্য কাব্যনাট্য 'বনবিবি'র কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কথা সাহিত্যের বড় একটা অংশজুড়ে রয়েছে সুন্দরবনের কথকথা। সুন্দরবন কেন্দ্রিক বর্ণিল সাহিত্য সম্ভারে ধরা পড়েছে প্রান্তিক মানুষ ও তাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। আল মাহমুদের "পশর নদীর গাঙচিল" এরকমই একটি ছোটগল্প। বংশানুক্রমে যারা বনের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, তাদেরও সামান্য কারণে ধরে নেওয়া হয় করমজল চেকপোস্টে। চালান করে সদরে। জেল জুলুম, মারপিট-এর মধ্যেই দিন গুজরান করে মোংলার কাইনমারী আর আশপাশ গায়ের লোকেরা।

গল্প বলার যেমন ধরন তেমনি উঠে এসেছে মোংলার আঞ্চলিক পরিবেশ। "মংলা বাজারের মাইক থেকে 'আসসালাতু খায়রুম মিনাননাউ'ম বাক্যটা সারা পরিত্যক্ত বন্দর এলাকায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যেন পশুর নদীর ঢেউ সুন্দরবনের শিকড় দিয়ে খামচে ধরা তেলতেলে মাটির ভিতর নোনা আঙুল ঢুকিয়ে বাদাবনকে চাঙ্গা করে দিচ্ছে।" (১)

গল্পের শেষ পর্যায়ে কাইনমারী গ্রামের নদী পাড়ের বাসিন্দা আমজাদ আলির অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা কর্পূর-এর জীবন সংগ্রামের কাহিনী চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। লাল পতাকাবাহী জাহাজের লোকজনের কাছে ছাগল বিক্রি করা টাকা না পেয়ে কর্পূর দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে কম্বল চুরি করে প্রাপ্ত টাকা উষুল করেছে। জাহাজের লোকজন তাকে ধরতে এলে জোরে বৈঠা বেয়ে পালিয়েছে। আল মাহমুদের সুন্দরবন কেন্দ্রিক এমন চমকপ্রদ গল্প রয়েছে অজস্র। "জলবেশ্যা" গল্পটিও আমাদের সমাজকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেছে। সুন্দরবন কেন্দ্রিক ধ্রুপদী গল্প 'জলবেশ্যা' বর্তমানে আন্তর্জাতিক ছবির মর্যাদা পেয়েছে। এই অসামান্য গল্পটি চলচ্চিত্র হওয়ার পর দেশেবিদেশে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। গল্পের পটভূমি এক নদী থেকে বেরোনো অসংখ্য খাড়ির মধ্যে এক স্থায়ী চির। সেখানে

মাসে কয়েক দিন বিশাল মশলার হাট বসে। হোলসেল মার্কেট। নানান বড় বড় ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে আসে। এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র এক বেদেনি বেউলা সুন্দরী। সে বিভিন্ন ব্যাপারীকে রূপের মোহে টেনে আনে তার নৌকায়। বিষদাঁত ভাঙা এক কালনাগিনী সাপ দিয়ে সে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নৌকা থেকে ডাঙায় নামিয়ে দেয়। (৩)

হাসান আজিজুল হকের 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে তুলে এনেছেন জঙ্গলের মধ্যে বসবাসকারী হত দরিদ্র মা মেয়ের হতবাক করা মর্মান্তিক জীবন কাহিনী। যাদের হিংস্র দানবরূপী সন্তানেরা রাতের অন্ধকারে মা মেয়েকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে নদীর চরে উলঙ্গ করে ভোগ করেছে। দিনের বেলা তাদের বাবা কাকারা এসে বিচার বসিয়ে মা মেয়েকে এলাকা ছাড়ার ষড়যন্ত্র করেছে। তীব্র প্রতিবাদের মুখে সে না পারলেও তাদের ব্যাথায় ব্যাথিত হয়েছে সুন্দরবনের বাঘ, শেয়াল, গোলপাতারা কিন্তু এই অসহায়াদের ব্যথা বোঝার মতো মানুষ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবুবকর সিদ্দিক এর "নোনা মাংশের গন্ধ" আর একটি জীবনধর্মী গল্প। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরি' হরিণের মাংসের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকে হরিণ শিকার করে, আবার অনেকে অল্প টাকায় কীভাবে হরিণের মাংসের স্বাদ পেতে পারে তারই অমানবিক প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে এ গল্পে। (১) সেলিনা হোসেনের 'দাদআলির কলজে' গল্পটিও অত্যন্ত চমকপ্রদ। এর প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে সুন্দরবনের বক্ষভেদ করে। পাঁচ বছর আগে স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে একমাত্র শিশুকন্যা ঝোরাই তার সঙ্গী এবং কাজের অবসরের সঙ্গী। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য কাঠ কাটতে এসেছে সুন্দরবনে। দশ মাস ডেরা বেঁধে কাঠ কেটে আবার ফিরে যায়। দাদআলির কলজের খোঁজ মেলে ঝোরার সাথে কথোপকথনে। মাঝরাতে বাঘের ডাক শোনা যায়। ভয়ে উঠে এসে বাবার কাছে বসে। বাইরে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালে।.....

– ভয় এরতিছে তোর? দাদআলি মেয়ের মাথায় হাত রাখে।–হয়, এয়ান্নেই যদি হালুম মইরে লাফায়ে পড়ে?– সেই লাইগে তো আমরা সারারাইত আগুন জ্বালায়ে রাহি। তুমি যহন এহেকালে জঙ্গলের মধ্যে যাও তোমার ভয় এয়ারেনা বাফ?

একফোঁটাও না। ভয় এয়ারবে ক্যান? সাথে কুড়োল দেহিস না এককোপে দেবো সাবাড় বানায়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে বাঘ এসে দাদআলির কলজে টেনে বের করে। অর্ধ উলঙ্গ মানুষের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে শক্তিমান ছোট গাল্পিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুন্দরবন মনস্ক দুটি ছোটগল্প "সাগর সঙ্গম ও অরণ্যপথ"। আশা পূর্ণাদেবীর 'হঠাৎদোলা' গল্পটি সুন্দরবনের এক মধুর স্মৃতিচারণ। (১)

সুন্দরবন কেন্দ্রিক এরকম প্রায় শ'খানেক গল্প রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বিপ্রদাস বড়ুয়ার ব্যাঘ্র শাবক শিকার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এর হরিণের মাংস। বাসব দাশগুপ্তের দক্ষিণ রায়ের মাথা, জাফর তালুকদারের বাঘ, সাধন চট্টোপাধ্যায় এর গহীনগাঙ। তাঁর 'কুমীর' প্রান্তিক জনপদ কুমীরমারি নিয়ে লেখা একটি বড় গল্প। শংকর বসুর টঙ, বুদ্ধদেব গুহ'র জোয়ার ও বনবিবির বনে, মহাশ্বেতা দেবীর বেহুলার ভাত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চূড়ামণি উপাখ্যান, দেবতা, জলজঙ্গলের কাব্য, তুষার কাঞ্জিলালের জগাই ও দামিনী, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর নৌকাবদল, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিকের মানসিক,

সুনীল দাশের হরিণ শিশু, বলরাম বসাকের পাথর রহস্য, মেকাইল রহমানের কাঁকড়ার খাল, জীবন সর্দারের ঝড়ের পরে, অমলেন্দু বিকাশ দাসের সোঁদা মাটির গন্ধ, সৌমেন দত্তের সুন্দরবনের ভূতের খোঁজে, ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদারের ডমরুচরিত, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বনে জঙ্গলে, রাজশেখর বসুর দক্ষিণ রায়, অমর মিত্রের-পাঁজর, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের-ভূ, আব্দুস সুকুর খানের-কাক, সৈয়দ রেজাউল করিমের-সরমার শরম নেই, হেমেন্দ্র কুমার রায়ের সুন্দর বনের রক্ত পাগল, সুন্দর বনের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ ও জীবজন্তুদের সহাবস্থান নিয়ে এ গল্পগুলো সুন্দরবনের পটভূমিকায় লেখা জীবনবাদী মানবিক মূল্যবোধের বিখ্যাত দলিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দীর্ঘদিন সুন্দরবনে নানান দ্বীপে ঘুরে ঘুরে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দেখে তার গল্পে তিনি বলতে চেয়েছেন- "সুন্দবনের মানুষেরা বাঁচে অন্যভাবে-তাদের মধ্যে আছে বাঁচার নগ্ন প্রচেষ্টা।" তার লেখা– গহন বন গহীন গাছ, নোনাগাঙ, অবিচার, অমানুষ, দণ্ডক থেকে মরিচঝাপি, আঘাত, ইত্যাদি উপন্যাসে আছে বাদাবনের মানুষের সংগ্রামী জীবনের কথা। সুন্দর বনের, বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত জেলেদের জীবনের গল্প দারুনভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তার আঠারো ভাটির মা ও শরৎগুনিন অবিস্মরণীয় ছোটগল্প। সদ্য প্রকাশিত লেখক পূজামিত্রের "উপকূল মঙ্গল" উপন্যাসে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের গল্প শুনিয়েছেন। নানান ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুন্দরবনের বাঘ, কুমির, হরিণ, সাপসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাথে। উপকূল মঙ্গলে ধরা পড়েছে বিচিত্র পেশাজীবী মানব জীবনের ভাঙা গড়ার কাহিনী। কোনোরকম বেচেবর্তে থাকা জীবনগুলোর উত্থান পতন, স্বপ্ন, স্বপ্ন ভাঙার যন্ত্রণা, নতুন স্বপ্নের সম্ভাবনা। নানা উপকাহিনীর মধ্যে সমাজের জেলে, বেশ্যা, মুচি, ডাকাত, ধাই, সর্বহারা কেউ বাদ পড়েনি। দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দারনীর ধীরে ধীরে মা হয়ে ওঠা এবং এক পতিতার দুঃখময়তা পাঠকের অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি। বেঁচে থাকার এক নিদারুন আহবান ঝলমল করে উঠেছে মানব বিজয় গাথা "উপকূল মঙ্গল" উপন্যাসে মেয়েকে স্বাভাবিক জীবন দিতে বদ্ধ পরিকর। (৩)

সুন্দরবনের অসামান্য রূপকার হলেন মনোজ বসু। তাঁর জলাজঙ্গল, বনকেটে বসত উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের জীবন পাঁচালি, বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনের বিশ্বস্ত দলিল। কথা সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'হলুদনদী সবুজ বন' সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাস। সুন্দরবনের বিভিন্ন জনপদও উঠেছে তার বিভিন্ন ছোটগল্পে। দীর্ঘদিন সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় "বনবিবির উপাখ্যান" এ সুন্দরবনের মানব ইতিহাস, জনজীবন, আরণ্যক পরিবেশ, মানুষের সংস্কার লোকবিশ্বাস ও মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন, তাঁর লেখা 'বাগদা' এ ধরনের আরও একটি উপন্যাস। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সাড়া জাগানো বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাস এর কাপালিক এর আবির্ভাব জঙ্গলের পটভূমিকায়। সেখানে কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার কাহিনী পাঠকের মনে ভীতি ও করুণার সঞ্চার করেছে। সুন্দরবনের উপর কয়েকজন বিদেশী লেখক সুন্দরবনকে প্রেক্ষাপট করে উপন্যাস লিখেছেন। অমিতাভ ঘোষের "হাংরি টাইড" উপন্যাসটি বর্তমান বিশ্বে সাড়া জাগানো উপন্যাস। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে অসংখ্য ঔপন্যাসিক সুন্দরবন ভিত্তিক মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ উপন্যাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল জব্বারের

"বাঘের খোঁজে" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরবন অন্য মাত্রা লাভ করেছে। শিশির দাসের তেভাগা গণ আন্দোলনকে নিয়ে সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা "শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা" তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নদী মাটি অরণ্য" মহাশ্বেতা দেবীর "বেহুলার বারমাস্যা", সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "গহীন গাঙ" সমারেশ বসুর, "গঙ্গা", মনোজ বসুর, "বনজঙ্গল, বন কেটে বসত", শিবশঙ্কর মিত্রের, "সুন্দরবনের আর্গান সর্দার" শক্তিপদ রাজগুরু'র, "দণ্ডক থেকে মরিচ ঝাঁপি", নোনাগাঙ, গহনবন গহীন গাঙ। এ ধরনের আরও অনেক লেখকের উপন্যাস সুন্দরবনভিত্তিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাম্প্রতিক সুন্দরবনকেন্দ্রিক প্রবন্ধ ও গবেষণা সাহিত্য নবরূপ লাভ করেছে। তথ্যভিত্তিক যে সকল গবেষক ও প্রাবন্ধিক আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্য রচনা করেছেন তঁদের মধ্যে ড. ইন্দ্রনীল ঘোষাল, ড. কুতুবুদ্দিন মোল্ল্যা, ড. নির্মলেন্দু দাস, ড.সুবীর মণ্ডল, ড. কমল চৌধুরী, ড.শঙ্কর প্রামাণিক সুরভী দাস, মনোজ কুমার সাহা, আজাদুর রহমান, খসরু চৌধুরী, বিলু কবির, রাজীব আহম্মেদ, তোফা খান, এবং হুমায়ূন খান। (৫)

২০২৪ সালে শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বাঘ বিধবাদের কথা গ্রন্থে বাঘের থাবায় নিহত অসংখ্য মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত অসহায় নারীদের মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনী। শংকর কুমার মল্লিক ও দেবপ্রসাদ বিসমিল লেখকদ্বয় বাঘের আক্রমণে যে সকল নারীর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তাদের বাঘ বিধবা আখ্যায়িত করে সুন্দরবনের প্রান্তিক অন্ত্যজ মানুষের জীবনকথা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে এনেছেন এই গবেষণা কর্মে। বিশেষ করে জীবন ও জীবিকার তাগিদে যে সকল মানুষ সুন্দরবনে মধু, কাঠ, গোলপাতা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যায় তাদের স্ত্রীরা বৈধব্যের জীবনে পদার্পন করে। সেই অসহায় নারীরা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটিকে হারিয়ে সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে গভীর সংকট মোকাবেলা করে বেঁচে থাকে সেই ছোট ছোট আখ্যানে মানবিকতার বীজ বপন করে নিপীড়িত ও নির্যাতিত নারীদের তুলে ধরেছেন । (৯)

সুন্দরবনকেন্দ্রিক রচিত কিছু গানের আবেদন বাদাবনের কাঠুরিয়া জেলে, মৌয়ালদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মানব মানবীর মনের কথা ছাড়াও তাদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ এবং মান অভিমানের চিরায়াত আবেদন মানব হৃদয়কে নাড়া দেয়। মোংলার বিখ্যাত মাতব্বর বাড়ির সন্তান ও খুলনা বেতারের শিল্পী মহানন্দ বিশ্বাসের কথায় ও সুরে অনেক গানে তিনি মানুষের হৃদয় হরণ করেছেন।

"ওদের কথা কেউ বলে না, আহা কেউ রাখে না মনে।
জীবন বাজি রাইখা যারা যায়রে সুন্দরবনে।।
জাইলা-মালো-বাওয়ালী আর গবীব দুঃখীজন
প্যাটের জ্বালায় হারায় দিশা, বাদায় যায় তখন।।"

কবিয়াল বিজয় সরকারের গানেও ধরা পরেছে সুন্দরবনের স্নিগ্ধতার মাঝে বাঘের ভয়ের চিত্র-

"সুন্দর বনের সুন্দর শোভা দেখতে এসে শেষে,
বাঘের ডাকে পরান কাঁপে মরি যে তরাসে

ভদ্রা নদী পার হতেই আজ ঘটিল জঞ্জাল
সেথা হাঙর কুমির দুরন্ত ভয়াল”
বিজয় সরকার এমন অনেকগুলি গান সুন্দরবন কেন্দ্র করে লিখেছেন।

তেমনি সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে মনোরঞ্জন সরকার অসংখ্য গান লিখেছেন-ভয়ংকর বাঘের কথাও ধরা পড়েছে তার জীবনধর্মী গানে-

সুন্দুর বনে বাঘের কোথা
কি যে কব আর,
হিংচ্ছোর আর চালাকিতি
জুড়ি নেই জগতে যার
..... ।।

বাঘিনীগে বাচ্চা হলি
পোলায় মদ্দি মালে,
মদ্দা বাঘে ঠিক পালি
বাচ্চা খায়ে ফ্যালে।

জীবনমুখী গানের পরিচয় খুঁজতে গেলেই চলে আসে খুলনার প্রয়াত অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার ভৌমিকের গানের মধ্যে–

“বাড়ির মানুষ কাঠ কাটতি
সুন্দরবনে গেছে
গোলেরপাতা আনবে বুলে
তিনখেন ডিঙি নেছে।
..... ।।

বাড়ির পাসে পশর গাঙে

জোয়ার আসে গেছে
কূল ছাপায়ে পানি উঠে
মলন ভাসায়ে নেছে।“

সুন্দরবনের বনজীবীদের দৈনন্দিন জীবনের মানবিক আবেদনের প্রতিচ্ছবি প্রায় প্রতিটা গানে উঠে এসেছে এবং এর উপর রচিত হয়েছে জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ও ভাটিয়ালির মত অসংখ্য গান। মায়ের থেকে মানবিক বিশ্ব চরাচরে আর কে আছে? সন্তানের বিপদে মা যেমন বুক পেতে দেন, তেমনি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বাঁচাতে সুন্দরবনের জুড়ি নেই। সুন্দরবনকে মায়ের আসন দিয়েছেন মনোজ কান্তি বিশ্বাস তার লেখা জারিগানে।

"আরে..... দক্ষিণে সুনীল সাগর.....শ্যামল সুন্দরবন
সন্তানের কাছে মা যেমন অমূল্য রতন।
উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে যেন.....সন্তানের পাশে মা
ঝড় বন্যা ঠেকাতে তার হয়না তুলনা।....."

অধ্যাপক বিভাষচন্দ্র বিশ্বাসের লেখা পটগান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাওয়া হয়ে থাকে। তিনি সুন্দরবনকে পট বা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে গানের ধুয়ায় বর্ণনা করে দু-একটি পটগান লিখে মানুষের কাছে সুন্দরবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সুন্দরবনকে নিয়ে আরও গান লিখেছেন অধ্যাপক গীতিকার নারায়ন চন্দ্র রায়, অধ্যপক দিলীপ কুমার মণ্ডল, চারণ কবি নিশিকান্ত সরকার, চারণ কবি অনাদী সরকার প্রমুখ। (৯) তথ্য অনুসন্ধান করলে এ ধরনের আরও অসংখ্য গানের সন্ধান মিলবে ।

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জীবজন্তু এবং এখানে বাসরত মানুষের ভাষা বুঝতে হলে গভীর সংবেদনশীল হয়ে তাদের পাঠ নেওয়া প্রয়োজন। মানব হৃদয়স্পর্শী ভীতি ও করুণারসের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বর্তমানে সুন্দরবন একটি জনপ্রিয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানব বসতি টিকিয়ে রাখতে সুন্দরবনকে যেমন আমাদের মায়ের মত ভালবাসা প্রয়োজন, তেমনি সুন্দরবন কেন্দ্রিক লিখিত অলিখিত সাহিত্য সংরক্ষণ করা এখন সময়ের দাবী। বর্তমান সমাজে ন্যায়, নীতি, সততা, আদর্শ তথা মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাহিত্যের আনন্দ আয়োজনে সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

তথ্য ঋণ :

১। কথা সুন্দরবন-দেবপ্রসাদ জানা, প্রকাশ কাল২০১০, দ্বীপ প্রকাশনী

২। বাংলা কবিতায় সুন্দরবন-বিভূতিভূষণ মণ্ডল, প্রকাশনী-বিভাষ, প্রকাশ কাল-২০১১

৩। উপকূল মঙ্গল-পূজা মিত্র, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, মার্চ২০২২,

৪। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী ২য় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৫। ড.সুবীর মণ্ডল, গবেষক পশ্চিম বঙ্গ ভারত, প্রবন্ধ-কথা সাহিত্যে সুন্দরবন।

৬। চর্যাগীতি-অতীন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক-নয়া প্রকাশ, কলকাতা ১৩৬৭।

৭। ভাটির দেশ-অমিতাভ ঘোষ, আনন্দ প্রকাশনী, নভেম্বর-২০০৯

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ড, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৬৬।

৯। সুন্দরবনের গান-বিভূতিভূষণ মণ্ডল, প্রকাশনী -বিভাষ, প্রকাশ কাল-২০১৯।

১০। "বাঘ বিধবাদের কথা"– শংকর কুমার মল্লিক ও দেবপ্রসাদ বিসমিল-শ্রাবণ প্রকাশনী, বই মেলা২০২৪

মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে মানুষই পারবে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে

সাহারা বেগম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে এশিয়ার ফুঁসফুঁস বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবন আজ আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত। বিপর্যস্ত সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে সুন্দরবনের উপর মানুষের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সেই আলোচনার প্রবেশের আগে আমরা সুন্দরবনের আয়তন, বৈশিষ্ট্য, নামকরণ, নদ-নদী ও খাল, উদ্ভিদ, প্রাণি, মাছ, বিশ্ব ঐতিহ্য ও রামসার সাইট, সুন্দরবনের অবদান ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করি।

সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে খুলনা, সাতক্ষীরা বাগেরহাট জেলায় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত। রায়মঙ্গল এবং হাড়িয়াভাঙ্গা নদী সুন্দরবনকে বাংলাদেশ ও ভারতের অংশে বিভক্ত করেছে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এরমধ্যে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত বাকি অংশ ভারতের মধ্যে অবস্থিত। সুন্দরবন আমাদের দেশের আয়তনের প্রায় ৪.০৮% এবং দেশের মোট সংরক্ষিত বনভূমির ৪৪%। এ বনের ৬৯% স্থল ভাগ ও ৩১% জলভাগ। ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য হলো উজানের মিষ্টি পানির প্রবাহ, প্রায় ৬ ঘণ্টা পরপর সামুদ্রিক লবণাক্ত পানির জোয়ার-ভাটা, কাদা চর, শ্বাসমূল এবং গাছে থাকতে বীজের অঙ্কুরোদগম।

সুন্দরবনের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে– (১) এ বনভূমির অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে একে সুন্দরবন বলে (২) সমুদ্রের তীরে বনের অবস্থান বলে সমুদ্রবন থেকে কালক্রমে এর নাম হয়েছে সুন্দরবন (৩) এ বনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী বৃক্ষের নাম থেকে এ বনভূমির নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরবনে প্রায় ৪৫০টি নদনদী ও খাল রয়েছে। এখানকার প্রধান নদীগুলো হলো– পশুর, শিবসা, শেলা, ভদ্রা, যমুনা, রায়মঙ্গল, ভোলা, মরজাত, আড়পাঙ্গাসিয়, মালঞ্চ ইত্যাদি। আর উল্ল্যেখযোগ্য খালগুলো শাপলা, মরাভোলা, কটকা, বাদামতলা, মৃগামারি, করমজল, জোংড়া, হরিণটানা, মরাপশুর, নন্দবালা, ধানসাগর, নিশানখালী ইত্যাদি।

সুন্দরবনে রয়েছে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল ও ১৩ প্রজাতির অর্কিড। বিশ্বের বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ বনে প্রাপ্ত ৫০ প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ৩৫টি প্রজাতিই রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণির আবাসস্থল। এদের মধ্যে রয়েছে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৮ প্রজাতির উভচর। এ বনের বন্যপ্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ,

মায়া হরিণ, বন্য শুকর, বানর, গুইসাপ, বন মোরগ, বন বিড়াল, উদবিড়াল, সজারু, কুমির, ডলফিন ও অজগরসহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ। সুন্দরবনে বসবাসকারী ৩০০ প্রজাতির পাখির অধিকাংশই স্থানীয় বা আবাসিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাছরাঙ্গা, মদনটাক, চিল, ঈগল, শকুন, বক, বাজ, ঘুঘু, কাঠঠোকরা, পানকৌড়ি, ফিঙ্গে, ভীমরাজ, পেঁচা, শামুখখোল, মাস্কড ফিনফুট ইত্যাদি। মাস্কড ফিনফুট বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন প্রাণি। সারা বিশ্বে মাত্র ৩০০-৩৫০টি মাস্কড ফিনফুট আছে যার ২০০-২৫০টির বাস সুন্দরবনে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘ আছে ১১৪টি (২০১৮ সাল), কুমির আছে ১৫০ থেকে ২১০টি (২০১৭ সাল), ইরাবতী ডলফিন আছে ৪৫০টি (২০০৬ সাল), শুশুক আছে ২২৫টি (২০০৬ সাল), চিত্রা হরিণ আছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৪টি (২০২৩ সাল), বানর আছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৪৪টি (২০২৩ সাল), বন্য শুকর আছে ৪৭ হাজার ৫১৫টি (২০২৩ সাল), গুই সাপ আছে ২৫ হাজার ১২৪টি (২০২৩ সাল) ও সজারু আছে ১২ হাজার ২৪১টি (২০২৩ সাল)। সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৩ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৪২ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। শীত মৌসুমে দুবলার চরের শুটকী পল্লীতে প্রায় ২০ হাজার জেলে শুটকী মাছ তৈরি করে। মৌসুম শেষে তারা পুনরায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

সুন্দরবনের জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় ১৯৯২ সালে সুন্দরবন ৫৬০তম রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে ৭৯৮তম প্রাকৃতিক বিশ্বঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুন্দরবন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠির জানমাল রক্ষা করে। সুন্দরবন সংলগ্ন ৩৫ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বনের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবন হতে মাছ, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ স্থানীয় জনগণের জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায়। সুন্দরবন অন্যান্য বনের চেয়ে বেশি কার্বন ধরে রেখে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করে ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক সেবা প্রদান করে। সুন্দরবনের অনেক বিরল ও বিপন্ন প্রাণির আবাসস্থল এবং অনেক মাছের নার্সারি গ্রাউন্ড। বাংলাদেশে বাঘের একমাত্র আবাসস্থল হলো সুন্দরবন। সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং ভ্রমণ-পিপাসুদের প্রশান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাসের জায়গা।

যেসব মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবন আজ ক্ষতবিক্ষত তাহলো বনে অগ্নিকাণ্ড, বিষ প্রয়োগে মাছ নিধন, বাঘ-হরিণসহ নির্বিচারে বন্যপ্রাণি হত্যা ও বৃক্ষনিধন, প্লাস্টিক দূষণ ও শিল্প দূষণ, কয়লা-তেল-ক্লিংকার ভর্তি জাহাজডুবি, নদীতে জাহাজের বর্জ্য নিক্ষেপ, বনভূমি দখল, নদী ভাঙন ইত্যাদি।

গত ২৪ বছরে সুন্দরবনে ২৬/২৭ বার আগুন লেগেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এতে প্রায় শতাধিক একর বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। বিগত সময়ে আগুন লাগার ঘটনায় বনবিভাগ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ১৫ বার জেলে-বনজীবী-মৌয়াল, ৪ বার দাবদাহ, ৪ বার মাছ আহরণ এবং ৪ বার আক্রোশমূলক ঘটনাকে দায়ী করা হয়েছে। বনবিভাগ ঘটিত বিগত সময়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সুন্দরবনে ২৩ বার অগ্নিকাণ্ডের কারণ হচ্ছে মানবসৃষ্ট। অথচ এসব ঘটনায় অপরাধীদের

শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আর যদি অপরাধীদের শনাক্তকরণ হয়েও থাকে তাও তাদের বিচার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। প্লাস্টিক দূষণে বিপর্যস্ত সুন্দরবন। সুন্দরবনের মধ্যে যেখানেই যাবেন সেখানেই প্লাস্টিকের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (বিসিএসআইআর) ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভিসেস এবং ব্রাজিলের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে সুন্দরবন সংলগ্ন পশুর নদ, রূপসা নদী ও মোংলা নদীতে ১৭ প্রজাতির মাছের দেহে মাইক্রো প্লাাস্টিকের কণা পাওয়া গেছে। গবেষণায় হরিণা চিংড়ির পেশিতে সর্বাধিক পরিমাণে প্লাস্টিকের কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রতি গ্রামে এর পরিমাণ ছিলো ৫৪.৩০ কণা এবং দাঁতিনা মাছে সর্বনিম্ন প্রতি গ্রামে ৫.৩৭ কণা বহন করেছিলো। ৫ মিলিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের প্লাস্টিকের টুকরোগুলোকে মাইক্রো প্লাস্টিক বলা হয়। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন "মাইক্রো প্লাস্টিকে আক্রান্ত এ ধরনের মাছ খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের পেটে মাইক্রোপ্লাস্টিক যায়। যদি এটি পেটে জমতে থাকে তাহলে পাচনতন্ত্র ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দিবে। যদি এটি রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থায় প্রবেশ করে, তবে লিভার ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। ডা. লেলিন চৌধুরী আরো বলেন "এর আগে আমরা ছোট মাছের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি দেখেছিলাম। এখন জানা গেল সামুদ্রিক মাছও একই হুমকির মুখে।" সুন্দরবনে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে সরকার সম্প্রতি সিঙ্গেল ইউজ (একবার ব্যবহার্য) প্লাস্টিক নিয়ে বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তবে শুধু সুন্দরবনে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ নয় সমগ্র উপকূলজুড়ে নিষিদ্ধ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন।

সুন্দরবনের প্রাণ পশুর নদীতে তেল-কয়লা-ক্লিংকার বোঝাই জাহাজডুবির ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হুমকিতে রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত পশুর নদীতে ১৩টি জাহাজ ডুবেছে। তবে সবচেয়ে আলোচিত ছিলো সুন্দরবনের শেলা নদীতে ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সাড়ে ৩ লাখ লিটার ফার্নেস তেলবাহী ওটি সাউদার্ন স্টার সেভেন জাহাজডুবির ঘটনা। এসব জাহাজডুবির ঘটনার পরে কে এটি উত্তোলন করবে, কিভাবে পরিবেশ ও সুন্দরবনের যাতে ক্ষতি কম হয় তার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। কোনো কর্তৃপক্ষ ঘটনার দায় নিতে চায় না। ফলে দীর্ঘদিন জাহাজটি নদীতে নিমজ্জিত থাকার ফলে সুন্দরবনের জলজ-প্রাণিসহ জীববৈচিত্র্য ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। কয়লা জাহাজডুবির বিষয়ে বাগেরহাট পরিবেশ অধিদপ্তরের এক সময়ের উপপরিচালক, আরেফিন বাদল বলেন "কয়লার মধ্যে আর্সেনিক, সালফার, সিসাসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকে। যা জলজ-প্রাণির জন্য ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন যদি কয়লা পানির মধ্যে থাকে তাহলে দূষণ বাড়ে।" মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের এক সমীক্ষায় জানা যায় পশুর নদীতে জাহাজডুবির মূল কারণ হলো ফিটনেসবিহীন নৌযান চলাচল। তাহলে ফিটনেসবিহীন নৌযান চলাচলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই জাহাজডুবির ঘটনা কমে যাবে বলে মনে করা যায়। এতে রক্ষা পাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য। আর যেকোনো জাহাজ

ডুবির ঘটনা ঘটলেই সংশ্লিষ্টদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হবে।

সুন্দরবনের খালে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধন এখনকার সময়ে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এবং কতিপয় অসাধু বনকর্মতাদের যোগসাজশে এসব জঘন্য কাজ হয়ে থাকে বলে প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে খবর আসে। সুন্দবনের খালে বিষ প্রয়োগের ফলে মাছের প্রজনন ব্যহত হচ্ছে। নানা প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। আর এই বিষযুক্ত মাছ ও পানি খেয়ে বন্যপ্রাণিরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে সুন্দরবনের জীববৈচিত্রের। তাছাড়া জোয়ারের সময়ে এই বিষযুক্ত পানি সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার চিংড়ি ঘেরে প্রবেশ করার ফলে চিংড়ি চাষে প্রতিবছর মারাত্মক বিপর্যয় দেখা যায়। নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে চিংড়ি মাছ যার ফলে ঘেরে মড়ক দেখা যায়। পত্রিকান্তরে এবং জনশ্রুতিতে জানা যায় একটি প্রভাবশালী মহল বিষ প্রয়োগের সাথে যুক্ত আছে। কাজেই বিষ প্রয়োগ বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে না চললে সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না।

সুন্দরবনে মানবসৃষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় হলো বাঘ-হরিণসহ বন্যপ্রাণি হত্যা ও নির্বিচারে বৃক্ষনিধন। গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খবর এসেছে বাঘ চোরাকারবারীদের আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট সুন্দরবনে সক্রিয় আছে। বাঘের দেহাংশ থেকে নানা রোগের ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র তৈরি হয় এধরনের গল্প/প্রচারণা (মিথ) থেকে সুন্দরবনে বাঘ চোরাকারবারীদের তৎপরতা আছে। সুন্দরবনে বাঘের সাম্প্রতিককালের আনাগোনা দেখে মনে হচ্ছে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘের কথা বলা হয়েছিলো। যদিও ২০০৪ সালে পাগমার্ক পদ্ধতি জরিপে ৪৪০টি বাঘের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছিলো। বর্তমানে ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতিতে জরিপ চলছে। আশা করা যায় ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবসে সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সুন্দরবনে বর্তমানে বাঘের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে। বাঘ চোরাকারবারিসহ বন্যপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য ও বন্যপ্রাণি অপরাধ যথাযথ ভাবে দমন করতে পারলে সুন্দরবন ভালো থাকবে বলে মনে করি। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এবং বন আইন ১৯২৭ অনুযায়ী বন্যপ্রাণি অপরাধ বলতে বন্যপ্রাণি এবং গাছপালা (জীবিত বা মৃত) এদের দেহাংশ এবং পণ্যসমুহের অবৈধ বাণিজ্য বা এদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বা এদের হত্যা, শিকার, ধরা, দখল, ভোগ, পরিবহন বা নির্যাতনকে বুঝায়। বন্যপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য একটি অটেকসই ব্যবসা, যা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় এবং প্রজাতি সমূহের উপর অতি মৎস্য আহরণ, দূষণ ও বন উজাড়ের মতো মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য যে সমস্ত কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন তার মধ্যে বন্যপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য অন্যতম। সুন্দরবনও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্য দমনে মূল চ্যালেঞ্জ হলো বন্যপ্রাণি অপরাধীদের গ্রেফতার করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা। ডাব্লিউ সি এস'র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বন্যপ্রাণির অবৈধ বাণিজ্যের প্রায় ৩০% ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ২০% এরও কম ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাংলাদেশের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে আদালতে দায়েরকৃত প্রায় ৪০০ মামলার এক চতুর্থাংশের চূড়ান্ত রায় দিতে আদালতের গড়ে আট বছর সময় লেগেছে বাকিগুলো এখনও অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া শাস্তিও তুলনামূলকভাবে

স্বল্প ছিল যা গড়ে এক বছরের কম জেল ও প্রায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা। পশুর নদে জাহাজী বর্জ্য নিক্ষেপের মাধ্যমে সুন্দরবন ও পশুর নদসহ অন্যান্য নদ-নদী দূষণ হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের এবিষয়ে নজরদারি বাড়ানো দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিল্পায়নের বিকল্প নেই। সুন্দরবন সংলগ্ন পশুর নদের পাড়ে মোংলা-দাকোপ এলাকায় ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে। এসব শিল্প-কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে সুন্দরবন ও পশুর নদ শিল্পদূষণের ঝুঁকিতে আছে বলে পরিবেশবিদ/গবেষকদের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে এসেছে। তাই পরিবেশ আইন এবং শিল্প আইন মেনে কলকারখানা পরিচালিত হচ্ছে কী-না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নজরদারি বাড়াতে হবে বলে মনে করি। এছাড়াও বনসংলগ্ন এলাকায় বসতবাড়ি গড়ে ওঠায় প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের বনভূমি দখল হচ্ছে বলেও গণমাধ্যমে খবর এসেছে। কোনো কোনো এলাকায় ভূমি অফিসের কর্তৃক খাসজমি ডিসিআরের মাধ্যমে বনভূমি বরাদ্দ দেয়ার অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করি। পশুর নদে নৌযান চলাচল বেড়ে যাওয়ার ফলে নদী ভাঙ্গনে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন অভিমতও আছে। সব মিলিয়ে সুন্দরবন মানবসৃষ্ট দুর্যোগ-পরিবেশ বিপর্যয়-দখল-দূষণ ও মুনাফালোভী অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারে আক্রান্ত। এমন কী বিশ্বব্যাপী অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে জলবায়ু সংকটের কারণে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর-আইলা-ফণি-মহাসেন-বুলবুল-আম্পান সর্বশেষ রিমাল এর মতো ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হলো সুন্দরবন, এর জন্যও মানুষ দায়ী।

সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মানুষের অত্যাচারে যেন সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে মানুষই পারবে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে। আসুন সুন্দরবন বাঁচাই, উপকূল বাঁচাই, দেশ বাঁচাই।

তথ্যসূত্র :

বন অধিদপ্তর, ডেইলি স্টার ও দৈনিক প্রথম আলো।

রবীন্দ্রনাথঃ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা

রূপা দাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

"আমাদের বেষ্টন করে আছো
অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো,
প্রতি মুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে
ধিকৃত অনিবার্য অভ্যাসের মতো।"

(সিকান্‌দার আবু জাফর)

রাজনীতির জব্বর ভেল্কিবাজী দেখিয়েছিল পাকিস্তান সরকার পাক আমলে। বাংলা-উর্দুর ঘোলা বাতাসে পাকিস্তান যখন বাঁচার রোগে ভুগছে–পাক সরকার তখন নজরুল ইসলামের কদর বাড়ায় হিন্দু রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড় করিয়ে এই রবীন্দ্র-নজরুল ব্রান্ড ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ তারা নেয়। ১৯৪৮ থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্রবৈরীতার প্রকাশ। এক বিশেষ চক্র হুজুগে প্রমত্ত বাঙালির সামনে অপব্যাখ্যা করে–রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়িক মুসলিম বিদ্বেষী।

বিশ্বব্রাত্যের সগোত্র জীবন্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রেতকৃত্যের শিকার হতে হয়েছে বারবার। চরম দলাদলির কুক্ষণেও তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মুক্তির জন্য ডাক দিয়েছেন। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটির সম্ভাব্যতা তিনি নাকচ করে দেন সঙ্গীতটিতে দেবী দুর্গা ও মা কালির স্তুতি উপস্থিত থাকার জন্য। তীব্রভাবে তিনি প্রশ্ন তোলেন–"ত্বং হি দুর্গা, কমলা কমলদল বিহারিনী"–ইত্যাদি হিন্দু নামধারিনী দেবীর স্তব.........মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে? সুস্থ ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ মত দেন–

"ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয়, মুসলমান-খ্রিষ্টান এমনকি ব্রাহ্মও......শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে।"

স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবে মুসলমানদের রাখী পরালেন– কোলাকুলি করলেন। বাংলা দ্বিখণ্ডিত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এজমালি সম্পত্তি। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রক্কালে বিপ্লবী মন্ত্রের উত্তাপ দিয়েছে। মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুকান্তের কবিতায় প্রেরণা পেয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ আত্মীকৃত।

নোবেল প্রাইজের যাবতীয় অর্থ (১,০৮,০০০ টাকা) শিলাইদহের দরিদ্র কৃষক প্রজাদের প্রদান করেন–যার ৮০% কৃষকই ছিলেন মুসলমান। বলা বহুল্য, সে অর্থ রবীন্দ্র ভাণ্ডারে আর ফেরৎ আসেনি। তিনিই মনে হয় প্রথম বাঙালি জমিদার, তার দরবারে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় ভেদ তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রজাবৃন্দকে যিনি একাসনে বসার ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। প্রজাকল্যাণে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কল্যাণবৃত্তি তহবিল। ৭৬ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একবার জমিদারী পরিদর্শনে উত্তরাঞ্চলে আসেন, তখন মাইলের পর মাইল হেঁটে তাঁর মুসলমান প্রজারা তাদের জমিদারকে শেষবারের মত দেখতে আসেন, তারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল শিষ্যজনের মতো। মানুষ বলতে রবীন্দ্রনাথ কখনো দেশ ও ধর্মের ফোঁটা চিহ্নিত মানুষকে বোঝেননি।

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রবিবেকের শেষ বয়সের আর্তনাদ। পান চিবুতে চিবুতে ভাতঘুমে সমর্পিত প্রাণ ও পরচর্চা প্রিয় বাঙালি এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও রবীন্দ্রনিন্দায় নিবেদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে এখন রবীন্দ্রনাথের নাম জড়াচ্ছে এক বিশেষ মহল। উল্লেখ্য, কোলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মিটিং যেদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথ পতিসরে ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা একটি সামাজিক সমস্যা। ধর্মকে অবৈধ ও অমানবিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে খাটালে সামাজিক গতিশীলতায় পচন ধরে। এই পচনধরা দ্রব্যটির নাম সাম্প্রদায়িকতা। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা আত্মসংস্কৃতির, অসাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পাবো। রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ভেদচেতনার উর্ধ্বের কবি– এটা যেদিন আমরা বুঝতে পারবো– সেদিন এই ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথেরও মুক্তি ঘটবে সবরকম সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা ও অপব্যাখ্যা থেকে। সেদিন আমরা জিয়া হায়দারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলবো–

"আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো।"

"ফানুস"

পলাশ চক্রবর্তী
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

একদিন স্বামী আর স্ত্রী বেড়াতে গেল চিড়িয়াখানায়। তারা দেখল একটি বানর তার সঙ্গীনির সাথে খেলছে, খুনসুটি করছে। স্ত্রী দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীকে বলল, কী চমৎকার ভালোবাসার দৃশ্য তাই না?

এরপর তারা গেল সিংহের খাঁচার কাছে। দেখল: সিংহ খাঁচার একপাশে চুপচাপ বসে আছে। সিংহীটাও অদূরে অন্য দিকে ফিরে বসে আছে। স্ত্রী দেখে বলল: আহারে! ভালোবাসার কি নির্মম পরিণতি!

স্বামী এতক্ষণ চুপচাপ স্ত্রীর পাশে হাঁটছিল। এবার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, এই ধরো, এই ছোট পাথরটি সিংহীর দিকে ছুঁড়ে মারো, আর দেখ কী ঘটে। মহিলাটি যখন ছোট পাথরটি সিংহীর দিকে ছুঁড়ে মারলো, সিংহটি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সঙ্গীনিকে বাঁচানোর জন্য গর্জন করে উঠলো। এবার স্বামী স্ত্রীকে বলল, মেয়ে বানরটার দিকে ছোট পাথরটা ছুঁড়ে মারো! দেখ কি ঘটে এবং পুরুষ বানরটার আচরণ লক্ষ্য কর। স্ত্রী ছোট পাথরটি বানরীর দিকে ছুঁড়ে মারলো। দেখাগেল পাথরটি ছুঁড়ে মারার আগেই পুরুষ বানরটা নিজের আত্মরক্ষার জন্য ছুটে পালিয়ে গেলো। সঙ্গীনির দিকে একবারও ফিরে তাকালো না।

স্বামী বলল: মানুষ তোমার সামনে যা প্রকাশ করে তা দেখে প্রভাবিত হয়ে যেয়ো না। অনেক মানুষ আছে যারা তাদের বানোয়াট, লোক দেখেনো আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে অন্যকে প্রভাবিত করে। আবার অনেক মানুষ আছে যারা তাদের ভেতরের গভীর অনুরাগ ভালোবাসা লুকিয়ে রাখে।

আর বর্তমানে এই সিংহদের চেয়ে বানরদের সংখ্যাই বেশি। আর মানুষ এই বানরদেরকেই পছন্দ করে।

বাল্যবিবাহ

রঞ্জিতা মন্ডল
প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সুখ-শান্তি, প্রেম-প্রীতির মধুরতম বন্ধন সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে মানব বংশের স্থায়ীত্ব ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তবে বাল্যবিবাহ দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ। পৃথিবীর যে কয়টি দেশে বাল্যবিবাহের প্রবনতা বেশি, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১২-১৬ বছরের মধ্যে। বিয়ের ১৩ মাসের মধ্যেই ৬৫% নারী সন্তান ধারণ করেন। গ্রামের নারীদের বেশির ভাগই বিয়ের এক বছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দেন।

গ্রাম অঞ্চলে বাল্যবিবাহ বেশি হচ্ছে কারণ এখানে নিরক্ষরতা, সামাজিক চাপ ও দরিদ্রের সংখ্যা বেশি। কিছু মানুষ সচেতন হলেও ব্যাপক পদক্ষেপ নেই। নারী মনে করে তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। পুরুষের পরিচয়ে সে পরিচিত হবে, ফলে তার অধিকার কিংবা সচেতনতামূলক কাজ থেকে অনেক দূরে থাকে। আমাদের সমাজ একজন মেয়ের জন্মকে সর্বনাশ হিসেবে ধরে নেয়। কম বয়সে কম যৌতুক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে, ফলে নির্দিষ্ট বয়সের আগেই ছোট মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পদের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বাবা-মা শখ করেও অল্প বয়সে বিয়ে দেয়।

সামাজিক কারণে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের প্রবনতা সবচেয়ে বেশি। আমাদের কৃষিনির্ভর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন অবহেলার শিকার হতে থাকে। অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে অভিভাবকরা কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করে। তারা মনে করে কন্যা সন্তান ভবিষ্যতে তাদের কোনও কাজে তো আসবেই না বরং বিয়ে দিতে গিয়ে বাড়তি খরচ যেমন যৌতুকসহ নানারকম ঝামেলায় পড়তে হবে। ফলে বাবা-মা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াটাকেই যুক্তির কাজ মনে করে। বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানী, তালাক, পতিতাবৃত্তি, অপরিপক্ক সন্তান প্রসবসহ নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে।

১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ আইন প্রণয়ন করা হলেও এখনো গ্রাম-গঞ্জ-মফস্বল এলাকাসহ সারাদেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে অহরহ। রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী, ছেলেদের ২১ বছর এবং মেয়েদের ১৮ বছর বিবাহের বয়স হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত বয়সের নিচে পক্ষদ্বয়ের যেকোন একজনের

বিয়ে হলেই সেটি বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য। দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে আইন বিদ্যমান। সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন রকম কর্মসূচিও পরিচালনা করছে। তবুও বাল্যবিবাহ অব্যাহত আছে। বেশিরভাগ বিয়ে আইনের পশ্চাতে এবং গোপনে হচ্ছে বলে এর সঠিক পরিসংখ্যানও নেই। এর মধ্যে ঢাকার বস্তিতে থাকা ৮০ ভাগ কন্যাশিশু বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। বালকদের মধ্যে এই হার কিছুটা কম। এই বাল্যবিবাহের মূলে আছে সুপাত্র প্রাপ্তি, দরিদ্রতা এবং যৌন হয়রানির ভয়। নানা ধরণের প্রতিরোধ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ রোধ করা যাচ্ছে না।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাল্যবিবাহ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় হারের দিক থেকে সর্বোচ্চ এবং বিশ্বে চতুর্থ। ব্রাকের অনুসন্ধান অনুযায়ী, মহামারির কারণে ১৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ আগের চেয়ে বেড়েছে এবং এটি গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সর্বোচ্চ হার।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ইউনিসেফের মতে, বর্তমানে বিশ্বে ৭০ কোটি মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার। এ ধারা চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে ৯৫ কোটিতে পৌঁছাতে পারে। সেভ দ্যা চিলড্রেনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ২০ শতাংশ ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই দুই বা ততোধিক সন্তানের মা হচ্ছেন। ফলে প্রসূতির মৃত্যুর হার এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ রোধে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ। বাল্যবিবাহ বন্ধে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া জরুরি শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ আইন মেনে চলা, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করা, বহুবিবাহ রোধ করা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ একটি আইন তৈরি করা একান্ত জরুরি। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের সব মন্ত্রণালয় বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ইমাম, ধর্মীয় নেতা, এনজিও প্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জোরদার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সোচ্চার হতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরি করতে পারলে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ নিরোধ করা সম্ভব।

জীবন মানেই ডেবিট ক্রেডিট

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

জীবনকে একটি হিসাবের খাতার সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ ডেবিট এবং ক্রেডিটের সাথে সমন্বয় করে জাগতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। ডেবিট হল আমাদের প্রাপ্তি, অর্জন, সফলতা, সুখ-সমৃদ্ধি, জাগতিক উন্নতি, যা আমাদের জীবনের সম্পদ। অন্যদিকে, ক্রেডিট হল আমাদের ব্যর্থতা, কষ্ট, দুঃখ-বেদনা, ত্যাগ, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা কিছু না কিছু গ্রহণ করি এবং বিনিময় হিসেবে কিছু না কিছু দিয়ে থাকি। সাফল্যের জন্য আমরা পরিশ্রম করি, যা ক্রেডিট। সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অর্জিত সফলতা ডেবিট। জীবনে কষ্ট ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা নতুন কিছু শিখি, যা আমাদের অভিজ্ঞতার খাতায় প্রতিনিয়ত ডেবিট হয়। এই ডেবিট এবং ক্রেডিটের সমন্বয়ে চলে জীবনের ব্যর্থতা সফলতা। যদি কেবল ডেবিট থাকতো, তবে জীবন সঠিকভাবে চলত না। আবার শুধুমাত্র ক্রেডিট থাকলে জীবন শেষ হয়ে যেত। তাই, জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য এই ডেবিট এবং ক্রেডিটের সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করেই আমদের জীবন প্রকৃত সাফল্য এবং সুখ অর্জন করা সম্ভব। তাই নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি জীবন মানেই ডেবিট ক্রেডিট।

মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম

আ.ই.শ.ম বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বিংশশতাব্দীর শেষপাদে এসে মানুষ যে সকল মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তার মধ্যে মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস অন্যতম। মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস এমন দু'টি ব্যাধি যা একটি রাষ্ট্র তথা সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত করে। মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস একদিকে পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে ও আইন শৃংখলার অবনতি ঘটিয়ে সামাজিক সংহতি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, অন্যদিকে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে করে ব্যাহত। যেহেতু মাদকসক্তি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাই মাদকাসক্ত লোকের পক্ষে যেকোনো ধরণের জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক হয়ে উঠে। তাই মাদকাসক্তি সকল সামাজিক অপরাধের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে।

আদিকাল থেকেই মানব সমাজে নেশার ব্যবহার প্রচলিত হয়ে এসেছে। নেশা শব্দটি আরবী নিশাতুন শব্দের বাংলা রূপান্তর। যার অর্থ আনন্দ প্রফুল্লতা, আমোদ, ভোগ ইত্যাদি। তবে বাংলা ভাষায় নেশা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। ড্রাগ শব্দটি ইংরেজি। ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ড্রাগের সংজ্ঞায় বলেছেঃ ড্রাগ হলো এমন বস্তু যা জীবন্ত জীব গ্রহণ করলে তার এক বা একাধিক কার্যকলাপে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটায়। মিসরীয়, সুমেরীয়, আসিরীয়, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে মাদক বা নেশাজাতীয় দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য বলতে মদ, গাঁজা, আফিম, চরস, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ভাং, তাড়ি, ফেনসিডিল, স্পিরিট বা এলকোহল প্রভৃতি বস্তুকে বোঝায়। আমাদের দেশে নেশার ব্যবহার পূর্ব থেকে কিছুটা থাকলেও হেরোইন শব্দটির সাথে সাধারণের পরিচয় ঘটেছে মাত্র তিন-চার দশক আগে। আমেরিকানদের নিকট এই হেরোইনের পরিচয় হোয়াইট ডেথ নামে, ইংল্যান্ডের লোকদের কাছে স্ম্যাক ডাস্ট, জাপানিদের কাছে ড্রাগন, চীনাদের কাছে চিংকচি আর আমাদের দেশীয়দের নিকট ব্রাউন সুগার, পুরিয়া, পাত্তি, ডাইল ইত্যাদি নামে পরিচিত। বর্তমানে আমাদের দেশ মাদকাসক্তির ক্যান্সারে আক্রান্ত। কিশোর থেকে শুরু করে প্রৌঢ় পর্যন্ত এক মরণ ছোবলের শিকার। বিশেষ করে যুব সমাজ আজ এর শিকারে পরিণত হয়েছে চরমভাবে। একটি জাতির ভবিষ্যৎ হল যুবসমাজ। তাদেরকে মাদকাসক্ত করে পঙ্গু করে দিতে পারলে জাতির ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়ে নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না। দেশের যুব সমাজ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ দেশের সার্বিক অধঃপতন। যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণকারী মূলশক্তি। যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারাই জাতির রাজনীতিক, কুটনীতিক,

শিক্ষক, সমাজসেবক: এক কথায় দেশের চালিকাশক্তি। এ যুব সমাজই যদি চরিত্রহীন হয় তবে দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা সব কিছুতেই এর প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য যার নিশ্চিত ফল একটি অধঃপতিত জাতি।

আমাদের দেশ আজ মাদক দ্রব্যে ছেয়ে গেছে। এক পরিসংখ্যান মতে ঢাকাতেই রয়েছে ১৩৮টি মাদক দ্রব্যের বাজার। এসব জায়গায় অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সাথে ফেনসিডিল বিক্রি হয় অবাধে। বর্তমানে ঢাকার প্রায় প্রতিটি মহল্লায়ই বিক্রি হচ্ছে মাদক দ্রব্য। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও বর্তমানে সকল শহর অঞ্চলে এমনকি গ্রাম-গঞ্জে পর্যন্ত সাধারণ পণ্যের মত সহজলভ্য হয়ে পড়েছে মাদকদ্রব্য। এভাবে মাদকের ব্যবহার জাতিকে প্রতিদিন নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে হত্যা, ছিনতাই, হাইজ্যাক, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ইত্যাকার নানা ধরণের অপরাধ। সেই সাথে মাদকাসক্তরা হচ্ছে পঙ্গু বিকলাঙ্গ, স্বাস্থ্যহীন, ধীশক্তি-বিস্মৃত।

অসংখ্য সমস্যার সাথে বর্তমানে মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস আমাদের সমাজকে অনিশ্চয়তার অতল গহ্বেরে তলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের উন্নয়নের সকল কর্ম-কাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করছে, এমকি নস্যাৎ করে দিচ্ছে। আমরা মাদকাসক্তির কয়েকটি কারণ নির্ধারণ করতে পারি–যথা: ১) বেকারত্ব ২) হতাশা ৩) অসৎসঙ্গ ৪) মাদক দ্রব্যের প্রতি কৌতূহল ও এর দ্বারা সহজ আনন্দ লাভের ইচ্ছা ৫) পারিবারিক প্রভাব ৬) ধর্মানুভূতির অভাব ৭) মাদক-দ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা। মাদক সমস্যা আমাদের একক কোনো সমস্যা নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এ সমস্যায় জর্জরিত। মাদক সমস্যা মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিশ্বসম্প্রদায় এ সমস্যা নিরসনে আজ একতাবদ্ধ। জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন মাদক বিরোধী কনভেনশন ও চুক্তি। এর মধ্যে ১৯৬১ সালের একক কনভেনশন ও চুক্তি, ১৯৭১ সালের মানুষের মানসিক আচরণ পরিবর্তন করার মাদকদ্রব্য সাইকোট্রোপিক সাবস্ট্যান্স সংক্রান্ত কনভেনশন এবং ১৯৮৮ সালের মাদক দ্রব্যের চোরাচালান বিরোধী কনভেনশন অন্যতম। বাংলাদেশ এ সকল কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে মাদক সমস্যা নিরসনে চলমান আন্তর্জাতিক প্রয়াসের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। সার্ক চেতনার আলোকে দক্ষিণ –পূর্ব এশিয়ায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রণীত সার্ক কনভেনশন ১৯৯০-এ বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরদানকারী দেশ। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধান কল্পে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অবৈধ মাদকদ্রব্যের চোরাচালান বন্ধের জন্য ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদকসক্তির প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এবং সামাজিকভাবে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তাহলো: ১) মাদকের কুফল প্রচার ২) দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব দূর করার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৩) মাদক নিবারণে সামাজিক আন্দোলন ৪) ধর্মানুভূতি ও নৈতিকতার জাগরণ ৫) সহজ প্রাপ্যতা বন্ধ করা ৬) পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সর্বপ্রথম। তবে একথা সত্য যে, এ কাজ সরকারের একার পক্ষে কিছুতেই

সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সমাজের বিবেকবান সকলকে যার যার সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে, তা না হলে আমাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিনষ্ট হয়ে যাবে পুরো সমাজ, দেশ ও জাতি।

ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে আরবগণ মাদকাসক্তিতে ছিল সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল মদ, জুয়া, নারী ইত্যাদি। ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগে তারা মদ্যপান করে হেন অপরাধ নেই যা করত না। তাই ইসলাম আগমনের পর প্রথম মদ্যপানকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে মদ্যপানকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি মদের নেশা চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে মদের পাত্র ব্যবহারের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইসলাম মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে:

"হে মুমিনগণ বস্তুত মদ সকল প্রকার মাদক দ্রব্য, জুয়া, প্রতিমা, (মানুষের নিজ হাতে তৈরি উপাস্য), ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কারসাজি, তোমরা এ (ঘৃণ্যকর্ম) থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সুরা আল-মায়িদা আয়াত: ১০)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন:

"শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা আল-মায়িদা আয়াত: ৯১) রাসুল (সাঃ) মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এর ব্যবহারকারী, উৎপাদনকারী ও সংশ্লিষ্টকারী সম্পর্কেও মারাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ও রাসুলের কঠোর নিষেধাজ্ঞার পরেও একজন মুসলমান মাদকাসক্ত হতে পারে না। কিন্তু যা বাস্তব তাহলো শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ এখন মাদকাসক্তির করাল গ্রাসে নিপতিত। ধর্মানুভূতির অভাব এবং ইসলামী অনুশাসন পালন না করার কারণে আজ আমাদের সমাজে ঘটেছে মাদকাসক্তির মতো মহাবিপর্যয়। তাই ব্যক্তি জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও সমাজে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল মাদকাসক্তির করালগ্রাস হতে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

এখন সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করছি। বর্তমানে আমাদের দেশে এটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। শুধু এদেশেই নয় বরং গোটা বিশ্বেই এটি এখন আলোচনার বিষয়বস্তু। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রীতিমতো শঙ্কিত সন্ত্রাসবাদের বিস্তারের কথা ভেবে। সন্ত্রাসকে যদি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এটিই এখন প্রধান সমস্যা। আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সন্ত্রাস আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে ঘাতক ব্যাধির ন্যায় সংক্রমিত হয়েছে। সন্ত্রাসের কুপ্রভাবে আমাদের সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতিটি হচ্ছে তাহলো সমাজে সর্বব্যাপী অশান্তির উপস্থিতি। সন্ত্রাসীদের ভয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চোখের নিদ্রাও পলায়ন করছে। অন্তরের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে। আমাদের দেশে সন্ত্রাস বেশিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে শিক্ষাঙ্গনে। তাই শিক্ষাঙ্গনে

সন্ত্রাস আমাদের দেশে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে এখন বিবেচিত। অনেক কষ্ট করে পিতা-মাতা সন্তানকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন তাদের ঘিরে থাকে। অথচ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে একদিন হয়ত প্রিয় সন্তানের লাশের কফিন পিতা-মাতাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সন্ত্রাসের ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দীর্ঘদিন থাকে অনির্ধারিত বন্ধ, ছাত্রজীবন হয় বিলম্বিত। রাজনীতির অঙ্গনেও চলছে সন্ত্রাসের মরণ ছোবল। গোটা সমাজ যেন আজ সন্ত্রাসের কাছে হয়ে পড়েছে জিম্মি। গৃহবধু থেকে শুরু করে ছাত্র, রাজনীতিক, সমাজপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী এবং সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসের যন্ত্রণা থেকে কেউ মুক্তি পাচ্ছে না। পত্রিকার পাতা পরিপূর্ণ থাকে প্রতিদিন হত্যা, নির্যাতন, ডাকাতি, হাইজাক, ছিনতাই, ধর্ষণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংবাদে। মানুষ আজ সন্ত্রাসের কাছে অসহায়। সন্ত্রাস জাতীয় উন্নয়নেরও বড় বাধা, এটা জাতি তথা দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছে। সাধারণ মানুষের পরম চাওয়া একটু সুখ-শান্তিকেও বানচাল করছে।

কিন্তু কেন এই সন্ত্রাস? কেন হয়েছে সন্ত্রাসের জন্ম? সমাজবাদীরা সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে বহুবিধ বিষয়কে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে মোটামুটিভাবে সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলোর উপর তারা একমত পোষণ করেছেন তাহলো: ১) সন্ত্রাসীদের প্রতি তাদের পিতা-মাতার উদাসীনতা, ২) রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ৩) বিদ্বেষপ্রসূত কর্মকাণ্ড, ৪) বেকারত্বের অভিশাপ, ৫) সম্মিলিত নাগরিক প্রতিরোধের অভাব, ৬) প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা, ৭) আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব, ৮) সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসন তথা নৈতিক শিক্ষা বিমুখতা প্রভৃতিই সন্ত্রাসের কারণ হিসাবে এখন চিহ্নিত, ৯) বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমগুলোতে প্রকারান্তরে সন্ত্রাসের প্রতি উৎসাহ যোগানো হয় বলে অভিজ্ঞজনের মনে কনে, ১০) চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের পর্দায় মারদাঙ্গা ছবির নামে সন্ত্রাসের চিত্র এমন ভাবে প্রদর্শিত হয় যাতে কোমলমতি কিশোরদের উপর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে উৎসাহিত হতে প্রভাব বিস্তার করে, ১১) প্রভাবশালীরা ক্ষমতার লোভেও কখনো কখনো সন্ত্রাস করে নির্দ্বিধায়। এখন কথা হলো, এই সন্ত্রাস কীভাবে দমন করা যায়? এ বিষয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনো মতেই কার্যকরভাবে সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না।

তাহলে কি এ সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় নেই? সব সমস্য সমাধানের নিশ্চয়ই উপায় আছে। এখন প্রশ্ন কোন সে উপায় যা দ্বারা সন্ত্রাস দমন সুনিশ্চিত ভাবে সম্ভব? এক কথায় যদি বলি তাহলে বলব: ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই সন্ত্রাস দমনের একমাত্র পথ। নৈতিক অবক্ষয়ই সন্ত্রাসের মূল কারণ। তাই সন্ত্রাস দমন করতে হলে চারিত্রিক উন্নতি অর্জন করা অপরিহার্য। মূলত: অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের একজনের সাথে আর একজনের সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে জন্ম হয় সন্ত্রাসের। অথচ রাসুল (সাঃ) বলেছেন "সকল মুসলিম মায়া মমতায় এক দেহের মতো। দেহের একটি অংশ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়লে সমগ্র দেহে তা অনুভূত হয়। রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন– "সেই প্রকৃত মুসলিম যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্যে নিরাপদ থাকে। বিদায় হজ্জের বাণীতে মানবতার নবী (সাঃ) উল্লেখ করেছেন, তোমরা একে অপরের ভাই। একজনের নিকট অন্যের জান-মাল আমানত স্বরূপ। রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন, তুমি জগতবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশবাসী

তোমার প্রতি দয়া করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেন " তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০৩) সন্ত্রাস যে সর্বগ্রাসী হয় এবং ভাল-মন্দ সকলকেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তোলে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা এমন ফিতনা (সন্ত্রাস) কে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ২৫) সন্ত্রাসীরা নিজেদের অপকর্ম স্বীকার করতে চায় না: কখনো কখনো দর্পভরে নিজেদের সমাজের অন্যতম ভাল লোক হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন: "তাদের যখন বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১১)

সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন: "দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) ঘটিয়ো না।" (সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৬) সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাসী) সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি (সন্ত্রাস) পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫) মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন; "নর হত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতিত কেউ কাউকে হত্যা করলে তারা যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল" (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩২)। রাসুল (সাঃ) অন্যায়-অত্যাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে কতিপয় তরুন ও যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংগঠন গড়ে তুলে ছিলেন, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও সামান্যতম লোপ পায়নি। কখনো নেতৃত্বের লোভে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়নি। তাই নেতৃত্ব পাবার লোভকে ইসলাম অযোগ্যতা বলে ঘোষণা করেছে। ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গের দুর্নীতিমূলক চাপে বিচার ও শাসন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না বলে কার্যকরভাবে সন্ত্রাস দমন হয় না। রাসুল (সাঃ) শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার অনুসরণে একবিংশ শতাব্দীতেও সন্ত্রাস দমনে সফল হওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল শান্তির ধর্ম, কল্যাণের ধর্ম, সে ধর্মের অনুসারী মুসলিম সমাজে সন্ত্রাসের শিকার হওয়া চিন্তা করা যায় না: অথচ শতকরা নব্বই জন মুসলমানের সমাজে আজ আমরা সন্ত্রাসের শিকার। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে, পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হবে।

পরিশেষে বলব, আমাদের জাতীয় ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম স্বাধীনতার জন্যে, তদ্রুপ মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও দল মত নির্বিশেষে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আমাদের সমাজ থেকে মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস দূর করা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। আসুন আমরা মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়তে আত্মনিয়োগ করার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করি। মহান আল্লাহ আমাদের মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূলের সংগ্রামে সাহায্য করুন, সফল করুন। আমীন !

অন্যরকম বন্ধুত্ব

মোসা: সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

আমি তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। আমাদের স্কুলের নিয়ম ছিল মেয়েরা কমনরুমে থাকবে, স্যারদের সাথে ক্লাসে যাবে আবার ক্লাস শেষে স্যারের সাথেই এসে কমনরুমে বসবে। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই কিলোমিটার। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কখনও পায়ে হেঁটে কখনও স্যারদের সাইকেলে চড়ে, কখনও ভ্যানে করে যেতে হতো। যে দিন পায়ে হেঁটে যেতাম সেদিন মূলত পিচের রাস্তা দিয়ে যাওয়া হতো না। রেললাইন ছিল রাস্তার পাশে। রেললাইনের ভিতরের দিকে কাঠের উপর লাফ দিয়ে দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যেতাম। শারীরিক গঠনও ছিল বাতাসের সাথে তালমিলিয়ে চলার মত এসব কারণে হাঁটাচলা সব সময় দ্রুত গতিরই ছিল। স্বভাবত স্যার যখন আমাদের ক্লাস নিতেন তখন আমি সব সময়ই সেই লাইনের প্রথমে থাকতাম এবং ক্লাসরুমের ফার্স্ট বেঞ্চের কর্নারে গিয়ে বসতাম। আমার এক সহপাঠী সব ক্লাসেই আমাকে প্রথম বেঞ্চের কর্নার থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে আমার পাশেই আমার জায়গায় বসত। ব্যাপারটি প্রথম দিকে খুবই বিরক্ত লাগত। যেহেতু ক্লাসে স্যার থাকতেন, একই ক্লাসে পড়ি এবং একটু বড়ও হয়ে গেছি তাই কিছু বলতে পারতাম না। এভাবে সে প্রতি ক্লাসেই এটা করত। পরে আমাকে আর ওর সরতে বলা লাগত না। আমি ওকে দেখেই পাশে সরে ওকে আমার পাশে বসতে দিতাম। তার পরে ওর জন্য জায়গা রাখতাম। এভাবে চলছিল। অনেকদিন স্কুল বন্ধ। তাই দেখাও হয় না আমাদের। হঠাৎ একদিন আমার সহপাঠী তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত। আমি তো ওকে দেখে অবাক। বলল কেমন আছিস। বললাম ভালো আছি? তুই কেমন আছিস। ভালো আছি বলেই দেরি না করে বলল আজ আমার জন্মদিন। তাই তোর জন্য একটি উপহার এনেছি বলে ডায়েরিটা আমার হাতে দিল। আমি তাকিয়ে আছি। বললো ভিতরে যা লেখা আছে পড়ে নিস। আমার মা এসে ওদের বসতে বলল। কিন্তু ওরা বসল না, চলে গেল। পরে ডায়েরিতে দেখলাম যে ও আমার এত দিনের ব্যবহারে খুবই খুশি হয়েছে। অন্য কেউ হলে এমন ছাড় দিত না। ওর লেখায় সেটা স্পষ্ট ছিল এবং খুব সুন্দরভাবে লেখা ছিল আমি যদি ওকে বন্ধু বলে মেনে নেই তাহলে এটা হবে তার ঐ জন্ম দিনের শ্রেষ্ঠ উপহার। আমি তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিলাম। যেটাতে আমি অনেক আগেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এটা ছিল আমার জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এমন ভাবে জন্মদিনে প্রস্তাব দিয়ে বন্ধুত্ব করার এমন আয়োজন আমার কখনও

স্বপ্নেও ছিল না। যেখানে আমাদের ভিতর ঝগড়া হওয়ার কথা ছিল হয়ে গেলাম বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব আজও আছে। হয়ত পাশাপাশি আর বসা হয় না। আমার একটু ছাড় আর ওর সেইটা অনুধাবনের ক্ষমতা তখন আমাদের বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। আমার একটু ছাড় আমাদের বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারত না যদি ও সেটা বুঝতে না পারত। আপনি যে ছাড় দেবেন বা দিচ্ছেন এটা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের থাকে না।

চিরদিন বেঁচে থাকুক সকল বন্ধুত্ব।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক, ভূগোল, মোংলা সরকারি কলেজ

মানবজাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় বায়ুমণ্ডল নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেশ পুরনো। তবে বায়ু মণ্ডলের উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। ধারণা করা হয়, বায়ুমণ্ডলের বয়স প্রায় ৩৫ কোটি বছর। তখন বায়ুতে জলীয়বাষ্প ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি ছিল। পরবর্তী সময়ে বায়ুতে তাপ ও চাপের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের পরিমাণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমরা জানি, ভৌগোলিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে জলবায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ভোগ বিলাসিতা অথবা উন্নয়ন চাহিদার কারণে জলবায়ু এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। যার দরুন পৃথিবীর উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রিন হাউজ প্রভাবের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপমাত্রার যে পরিমাণ পৃথিবী গ্রহণ করে, তার সবটাই আবার বিকিরণ হয়ে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু বর্তমানের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সৌর তাপের কিছু অংশ বায়ুমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ স্তরে থেকে যাচ্ছে এবং গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ মারাত্মক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে যাকে "বিশ্ব উষ্ণায়ন" বা Global Worming নামে অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন কারণে ভূ-উষ্ণায়ন হতে পারে। যেমন: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, মহাকাশ থেকে উল্কাপতন ইত্যাদি। এছাড়া মানবীয় কারণগুলিকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা যায়, যেমন: জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, শিল্পায়ন, নগরায়ন, যানবাহনের কালো ধোয়া, গৃহস্থালির বর্জ্য, বৃক্ষনিধন ইত্যাদি। এছাড়া পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, পৌর জঞ্জাল থেকে পচন ইত্যাদি থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বায়ু দূষণের মতো ঘটনা ঘটে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান পৃথিবীর জলবায়ুকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়ুমন্ডল ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। ফলশ্রুতিতে ঋতু বৈচিত্র্য বলে আর কিছু থাকছে না। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড তাপ ও হাড় কাপানো শীত, খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অহরহ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে পৃথিবীর অবস্থা দুর্যোগের চরম সীমায় পৌঁছাবে।

অতীতেও জলবায়ুর এ পরিবর্তন ছিল। তবে সেটি ছিল একটি ধীর প্রক্রিয়া; সময় লাগতো লক্ষ লক্ষ

বছর। কিন্তু চিন্তা ও আতঙ্কের বিষয় হলো বর্তমান সময়ে এ পরিবর্তন ঘটছে, খুব দ্রুত গতিতে। আর এ দ্রুত পরিবর্তনের একটা বড় কারণ হলো এর ৯০% ই মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফল। যার দরুন বিগত ১০০ বছরের পূর্বের তুলনায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ০.৬০° সেলসিয়াস।

জলবায়ু এ পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, গরমকালে শীত ও শীতকালে গরম ইত্যাদি অনিয়ম দেখা দিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে ঋতু বৈচিত্র্য হ্রাস। শৈত্য প্রবাহ, তাপ প্রবাহ, ওজন স্তর হ্রাস, সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন দুর্যোগ মানুষের নিত্য জীবনের সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিক তাপ প্রবাহের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলন ও তার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। মোট কথা সারা বিশ্বের মানুষ বর্তমানে প্রকৃতির প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে টিকে থাকছে। কেউবা আবার ঢলে পড়ছে অকাল মৃত্যুতে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে মহাবিপর্যয় অনিবার্য। তাই আমাদের উচিৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কীভাবে প্রকৃতিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া। যেমন কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। অবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাস উপযোগী পৃথিবী গড়ে তুলতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রচুর গাছ লাগানো ও ফসল চাষের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করে মরুময়তা রুখতে হবে। দিন দিন তাপমাত্রার এ অসহনীয় বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে বৃক্ষ রোপনের কোনো বিকল্প নেই।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করতে ইকোস্কুল বা সবুজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। গ্রিন হাউজ গ্যাস বা কার্বন নিঃসরণ কমানো, সবুজায়ন-ছাদকৃষি সম্প্রসারণ, নারী বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিচালনাসহ বিবিধ কার্যক্রম সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

এছাড়া জৈব বর্জ্য পদার্থের খোলামেলা পচন না ঘটিয়ে এগুলোকে জৈব সারে রূপান্তর করতে হবে। ইউরো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটরযান থেকে দূষণ হ্রাস করতে হবে। প্রত্যেক দেশে অর্থাৎ বিশ্ব জুড়ে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বোপরি শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন এর মতো গ্যাসগুলোর নির্গমণ কমাতে হবে। পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহার বর্জন করতে হবে। উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোর দিকে বাস্তবিক দৃষ্টিপাত করলে জলবায়ু পরিবর্তনের এ ভয়াবহতা কিছুটা হলেও প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি।

ব্যবধান

স্বস্তি দীপা চক্রবর্তী
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান (খণ্ডকালীন)

একদিন মন্দিরের মেঝেতে থাকা একটি সাধারণ পাথর মূর্তি বানানো এক পাথরকে বলছে ও ভাই দেখেছো আমরা দুই জনই পাথর অথচ মানুষ তোমাকে কত আদর ভালোবাসাদেয় ও সম্মান করে, তোমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখে, তোমাকে ভক্তি করে, তোমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করে আর আমাকে মানুষ পাড়িয়ে পাড়িয়ে পিষ্ট করে ফেলে।

তখন মূর্তির পাথরটি মেঝেতে থাকা পাথরটিকে উত্তর দিল, আজ হয়তো তুমি আমাকে দেখছো মানুষ আমাকে ফুল দিচ্ছে, পুজো করছে কিন্তু যেদিন আমাকে লোহার যন্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে এই মূর্তিতে পরিণত করেছে সেই কষ্ট বলার মতো ভাষা আমার নেই।

আমি সেদিন সহ্য করে ছিলাম বলেই আজ মানুষ আমাকে ফুল দিচ্ছে, পুজো করছে। আর তুমি সাধারণ পাথরের মতো দিন কাটাচ্ছ।

শতবর্ষী চাঁদপাই মেলা

মোঃ ইব্রাহিম খলিল
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মোংলা সরকারি কলেজ

'ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।'

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই চরণের সাথে মিল রেখে বলা যায় মোংলাবাসীদের মনে এমনই এক বসন্তের সুশীতল হাওয়া বয়ে চলে মোংলার ঐতিহ্যবাহী চাঁদপাই মেলা উপলক্ষ্যে। এই মেলাটি পীর মেছের শাহের মেলা নামেও পরিচিত। এই মেলাটি শুধু মোংলারই নয় বরং দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় মেলা। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের পঞ্চম চাঁদের দিনে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নে অবস্থিত পীর মেছের শাহের মাজার প্রাঙ্গণে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাৎসরিক উরস উপলক্ষ্যে পীর মেছের শাহের ভক্তরা শতবর্ষী এই মেলায় যোগ দিতে আসেন।

হযরত পীর মেছের শাহের (রঃ) জীবনী এবং মোংলার চাঁদপাই অঞ্চলে তাঁর আগমন ও দেহত্যাগের সুনির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে লোকমুখে একথা প্রচলিত যে, হযরত পীর মেছের শাহ (রঃ) সুদূর ইয়েমেন থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে আসেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন। আরেকটি পক্ষ বলে থাকেন তিনি নবী করিম (সাঃ) এর দেশের অধিবাসী ছিলেন। তবে কোনটি সঠিক সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানা যায়নি। জনশ্রুতি অনুযায়ী খান জাহান আলী (রঃ)'র পরপরই পীর মেছের শাহ (রঃ) এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। তিনি সর্বপ্রথম রামপাল উপজেলার ঝনঝনিয়া গ্রামের হামদু ইজেরদারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখান থেকে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে অনেক আশ্চর্য সাধন করায় পীর মেছের শাহের (রঃ) অনেক ভক্ত–অনুসারী গড়ে ওঠে। এরপর এক পর্যায়ে ধর্ম প্রচার করতে করতে তিনি মোংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের এসে উপস্থিত হন। তৎকালীন চাঁদপাই অঞ্চলটি গভীর অরণ্য ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পীর মেছের শাহ (রঃ) এই বনজঙ্গল কেটে ভূমি আবাদের মাধ্যমে মানুষের বসতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সঙ্গী–সাথীরা দিনরাত বনজঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে লেগে পড়েন। এভাবে কাজ করতে করতে একদিন অবাক করা ঘটনা ঘটে। সেদিন পীর মেছের শাহের (রঃ) অনুসারীরা তাদের কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, কখন যে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল সে সম্পর্কে তাদের চৈতন্য ছিল

না। তারা মনে করেছিলেন সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক সময় বাকি আছে। কিন্তু হঠাৎ তাদের মাঝে জ্যোৎস্না শোভিত চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ সূর্যের পরিবর্তে তারা চাঁদের দেখা পেয়ে যান আর এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পীর মেছের শাহ (রঃ) এই স্থানের নামকরণ করেন চাঁদপাই। চাঁদ পাওয়া থেকে চাঁদপাই নামে নামকরণ হয়েছে বলে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে থাকেন। দীর্ঘদিন ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর পীর মেছের শাহ (রঃ) এখানেই দেহত্যাগ করেন। এখনও অনেক দূর দূরন্ত থেকে ভক্তরা তাঁর মাজার জিয়ারত করতে এখানে আসেন। অনেকের বিশ্বাস এখানে কিছু মানত করলে তা পূরণ হয়। বিখ্যাত সুফি-সাধক ও পীর মেছের শাহের (রঃ) স্মরণে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শতবর্ষী চাঁদপাই মেলা বা পীর মেছের শাহরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর পীর মেছের শাহের (রঃ) ভক্তরা এই মেলা উপলক্ষ্যে অনকে দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে জিকির করতে থাকেন। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ভক্তদের দুই ঠোঁটে কুলুপ (এক ধরণের তালা) এঁটে জিকির করা এবং জিকির করতে করতে এক সময় সেগুলো খুলে যায়। আর এটি দেখার জন্য ছুটে আসেন হাজার হাজার দর্শনার্থী।

চাঁদপাই মেলা এ অঞ্চলের মানুষের আবেগ ও অনুভূতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেলার আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মেয়ে–জামাইদের বাবার বাড়িতে আনতে যাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এ মেলাটিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের মানুষদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবার–পরিজনের মাঝে এক মিলনমেলার আবহ তৈরি হয়। এ মেলাতে গৃহস্থালির নিত্যব্যবহার্য প্রায় সকল ধরনের জিনিস সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে কসমেটিক্স পণ্য, শিশুদের খেলনা, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র ও মাটির পুতুল এবং কাঠের আসবাবপত্রসহ স্থানীয় শিল্পীদের হস্ত ও কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন খাবারের দোকানের পাশাপাশি এখানে ময়রারা স্থানীয় বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বসেন। এখানে বিনোদনের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, চরকি, নৌকা রাইড প্রভৃতি। এ মেলাটি শুধু মোংলারই নয় বরং দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় মেলা। স্থানীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে চাঁদপাই মেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

তামিমা হাই-এর লেখা
দ্বাদশ শ্রেণি, রোল নং-২৩০২৭

(১)

জীবন

‘জীবনে কোনো অনুশোচনা নেই, কেবল পাঠ।’

জেনিফার অ্যানিস্টন

জীবন। তিন অক্ষরের ছোট্ট একটি শব্দ। অথচ কত ভার এই এক জীবনে। কত দায়িত্ব, কত আশা কত আক্ষেপ, কত স্বপ্ন! তবু, জীবনের মতো সুন্দর আর কিছু কী আছে? কত সাধের এই জনম আমাদের! জীবন নিয়ে ভাবতে বসলে আমার বিস্ময় কাটে না। ঠিক এই সুন্দর জীবনটাকে আমরা টেকেন ফর গ্রান্টেড বানিয়ে ফেলি। একবার গেলে কি আরেকবার পাওয়া যাবে? জীবন নিয়ে আমাদের আফসোসের শেষ নেই। এটা হলো না কেনো? ওটা পেলাম না কেনো? আমার সাথেই কেনো এমন হয়? আচ্ছা আমরা কী কখনো ভেবে দেখেছি, এই যে আমরা প্রতিটা দিন বেঁচে থাকছি এটাই কি খুব আশ্চর্যের ঘটনা নয়?

ওয়াসিকা নুযহাত তার ‘অক্টোবর রেইন’ বইতে লিখেছেন, ‘হাজার রকম দুর্ঘটনা আর রোগ শোকের বিপরীতে সুস্থভাবে নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকাটাই যে আজকের পৃথিবীতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা তা সাধারণ লোক ভেবে দেখে না। মানুষের বেঁচে থাকার প্রত্যেকটা দিন আসলে লটারি জেতার মতো। এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারলে যাবতীয় পার্থিব টানাপোড়েন অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হওয়ার কথা।’

(২)

‘প্রতিদিন আমাদের এমনভাবে কাটানো উচিত, যেনো আজ জীবনের শেষ দিন।

সেনেকা

জীবনে চলার পথে অনেক কঠিন পরিস্থিতি আসে এবং বর্তমান সময়ের একটা ট্রেন্ড হচ্ছে আমরা সামান্যতেই হতাশ হয়ে যাই, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। জীবনের খেই হারিয়ে হাপিয়ে উঠি একটুতেই। ‘ডিপ্রেশন’ নামক অসুস্থ আমাদের সুন্দর জীবনটা গ্রাস করে নেয় নিমিষে, চোখের পলকে। অথবা চাইলেই আমরা সব দুঃখ–জড়তা এক পাশে রেখে ছোটো ছোটো সুখ খুঁজে নিতে পারি। অল্পতেই খুশি থাকা সুখে থাকার মূলমন্ত্র বলা যায়। আমার খায়্যাম বলেছেন, ‘এই মুহুর্তের জন্য আনন্দিত হন। এই মুহূর্তটি আপনার জীবন।’ জীবন সাক্ষাৎ এক যুদ্ধক্ষেত্র। এখানের প্রত্যেকটি ভুল পদক্ষেপ আমাদের নতুন করে বাঁচার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তবু আফসোস করা ঠিক নয়। যা ঘটার তা তো ঘটেই

গেছে। জীবনে একবার ঘটে যাওয়া ঘটনা আমরা শত চাইলেও বদলাতে পারবো না। হুমায়ুন ফরিদী বলেছেন, ‘জীবন নিয়ে যে যতো বেশি আপসোস করে, তার জীবনে ততো বেশি দুঃখ।’ আমাদের উচিত সবসময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনযাপন করা। এই যে আমরা হুট করে বলে ফেলি, আমার দ্বারা হবে না, সম্ভব না এগুলো ভুল কথা। বিখ্যাত অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন বলেছেন, “ কিছুই অসম্ভব নয়। শব্দটি নিজেই বলে, ‘আমি সম্ভব!”

(৩)

Life is a beautiful flower, we should feel it’s Fragrance!

নৌশিন আহমেদ রোদেলা

জীবনকে অনেকে অনেকভাবে, অনেক উপমায় সংজ্ঞায়িত করে। কেউ মুদ্রা, কেউ সাইকেল, কেউবা কলম, ঘড়ি, ফুল, পর্বত কিংবা নদীর সাথে। সবশেষে বহমানতাই জীবনের প্রধান শর্ত। আমি জীবনকে বৃক্ষের সাথে মেলাতে পারি। বৃক্ষকে যতটুকু দেওয়া হয় সেও আমাদের ততটুকুই ফেরত দেয়। জীবনও বৃক্ষের মত, যত্নের অভাবে ঝরে যায়। তবে জীবনটাকে সুন্দর করতে ভালোবাসা অত্যধিক জরুরি, যেমনটা বৃক্ষকে সতেজ রাখতে পানি। ইউরিপিডিস এর মতে ‘জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো ভালোবাসা।’ ভালোবাসা ছাড়াও জীবন চলে। তবে উৎফুল্লতা হরায়। জীবনে মানুষের যাওয়া আসা লেগেই থাকে। তবে বাঁচতে ভুলে গেলে চলবে না। জুনায়েদ ইভান তার ‘শেষ’ বইতে লিখেছেন,

‘একা মানুষের পিছুটান নেই, কথাটা সত্য নয়। জীবনের প্রতি ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড় পিছুটান।’ তাই জীবনকে ভালোবাসা উচিত। জীবনটাকে উপভোগ না করে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? স্বপ্ন একটি মাধ্যম হতে পারে। স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখো, স্বপ্নব্যতীত জীবন কোনো জীবনই নয়। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখা উচিত। কারণ স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবনে ভালো থাকতে চাইলে আমাদের সর্বপ্রথম নিজের স্বপ্নকে, নিজেকে প্রাধান্য দিতে হবে। নিজেকে ভালোবাসার মতো সুন্দর ব্যাপার আর দুটি নেই। নিজেকে ভালোবাসা উচিত তবেই জীবন সুখের না হলেও স্বস্তির হবে।

‘তুমি একবারই বাঁচবে কিন্তু যদি সঠিকভাবে বাঁচো, একবারই যথেষ্ট।

Be Imperfect

Tabassum Jannat Turana
Class-XII, Roll No.-23049

Hey! Aren't you tired of tying to be a perfect person? Maybe you are that one person who has always been called a very good/beautiful/brave/talented/well mannered / honest kid since very beginning. Now you just want to maintain that perfect person in you, But tell me in a world of critics you think you can be a perfect person, But there will always be some flaw in you. It is neither your fault nor the people who see it. Maybe it's the time you should ask yourself why you want to be perfect. No....Before that you should ask yourself what perfection means to you, So before making any attempt towards being perfect tell yourself something who sets these standards for you to be the one?

Was that you? No!

Was that your loved one who already loves you? No.!....

Was that the other person? Yes!

90% of our problems that evolve and encircle our lives are because of that "Other Person" with whom we may even not be concerned.

The Concept of Perfection

What does the word 'Perfect' mean to you? Is it something which is flawless, fits the standard (Which is not even set by you) and approved by all? Or is it just a concept which doesn't even exist? I know 90% of you didn't like that second line. Maybe you are going to tell me that there are people who are perfect like your parents, teacher, best friend, crush or someone else, you idolize. But are you sure they are perfect in everything? I don't think so. According to me if you think a person is perfect, in reality you don't know them. Because as none in the world is completely happy.

there is always some flaw, some desire in person art or thing (if it is not artificial). Everyone has his own perfection. That's the variety of the world. Imperfection are just feathers in our crown. Just remember Perfection is just a theory but it doesn't have any practicality.

Imperfect world

Rainbows can't be seen everyday. Sunrise doesn't last for long, night has darkness, stars and fireflies can't be seen at day, flowers have to wait for the right time to bloom, all flowers don't smell good, all plants are not useful, your favorite sport team doesn't win every time, all weather is not comfortable for you, all of your cousins don't give you same vibe, some times you are not loved by the people you love, sometimes you cant love the people who love you.....

Aren't they imperfect? But you, me, all love these. Maybe we don't love the things that are perfect, we love the thing that is good for us.

"There is no real beauty without some

slight imperfection''....
Heamin sunim.

Accept the Imperfection:
"The more [heel imperfect the more]
feel `ALIVE'
Jhumpa Lahiri

Perfection is what you want in life. But why? To match the world standard? It's a good thing you want to be beautiful/studious/healthy/wealthy. All the best for your future. But don't change to match others standard. Change for yourself. match your standard. Imperfections are not our flaw. It's our speciality. It's a reason for our daily hard work. When the whole world is imperfect why cant we? The imperfection in us prove that we are not artificial. We are anted by God. Our life is for from perfection. Then why do we want ourselves so perfect? For happiness? Happiness is not something to be attained when everything around it is perfect — It can't be. Instead, it means we can find contentment and happiness and joy even in the midst

of imperfection. when we begin to realize happiness is fully available to us today regardless of our circumstance the better our chances become of finding it. For me happiness isn’t in waiting for the time to stop the storm. Its whan we learn to enjoy the rain and dance with its flow. Happiness can be found without imperfections. Even it can’t be found without imperfection. There why we ran after perfection instead of happiness? There is no such perfect Person. Everyone has flaws, Its completely OK that you are not ‘PERFECT’. Let’s just accept the imperfections in us and love the imperfection around us. Let’s not set our goal to be perfect. Instead Let’s be the best version of ourselves. Be good for yourself.

Be Yourself:

When you learn to love the imperfections around you. You can easily love the imperfections in you if you are afraid of people’s opinion. If you want to be a perfect person for someone you love. You hide you imperfection to be loved by people. Then trust me if a person only loves you perfection, he/she doesn’t love you. Love is when you accept and respect all the imperfection. Even when the world refuse you for your imperfection. Then ignore the whole world and believe in God who made you and love yourself. Be the biggest fan of you. Love your every single things. Just “BE IMPERFECT”.

সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য

শেফালী মণ্ডল
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

"আমাদের সুন্দরবন
এ যে সাত রাজার ধন,
এ যে মোদের অমূল্য সম্পদ'
তবে কেন এই ধ্বংসের ফাঁদ?

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে। সব পরিবেশে সব ধরনের জীব বাস করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায় যাকে জীববৈচিত্র্য বলে। কিছু উদ্ভিদ আছে যা বাংলাদেশের সব জেলাতেই পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যা কেবল সুন্দরবনে পাওয়া যায়।

আজ থেকে ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবন ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে গেছে। তবে আয়তন এতটাও সংকুচিত হয়নি যে তার আয়তন ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটারে নিম্নে হবে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই বেশি যে মানুষ মাত্রই সকলের মন কাড়ে। সুন্দরবন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশ ও ভারতের অংশে অবস্থিত সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্বপেক্ষা বড় ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের বড় অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে খুলনা সাতক্ষীরা পার হয়ে পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি, সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা, হেঁতাল, কাঁকড়া, বাইন, পশুর, ধুন্দুল, হাড়গোজা ইত্যাদি এসব উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো। এদের মাটির নিচের মূল থেকে অনেকগুলো মূল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে, যাকে বলে শ্বাসমূল। শ্বাসমূলের মাধ্যমে সুন্দরবনের অনেক উদ্ভিদ বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সুন্দরবনের অনেক উদ্ভিদের ঠেসমূল উৎপন্ন হয় যা গাছকে সোজা ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ঠেসমূলের কারণে সুন্দরবনের এসব উদ্ভিদ জোয়ার ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য

করতে পারে। সুন্দরবনের উদ্ভিদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের বীজের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে।

১৯০৩ সালে ডি প্রেইন সুন্দরবনের পাছপালার উপর লিখিত তাঁর গ্রন্থে ২৪৫ গণের অধীনে ৩৩৪ টি উদ্ভিদ প্রজাতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে ১৭টি ফার্ন জাতীয়, ৮৭ টি একবীজপত্রী। বাকি ২৩০ টি দ্বিবীজপত্রী। ৫০টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কেবল সুন্দরবনেই আছে ৩৫টি প্রজাতি। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার লবণাক্ত পানির বাসভূমিতে গেওয়া, গরান, কেওড়া, ওড়া, পশুর, ধুন্দুল, বাইন এবং অন্যান্য ঠেসমূলবাহী উদ্ভিদ প্রধান।

উদ্ভিদের পাশাপাশি সুন্দরবনে রয়েছে নানা ধরণের প্রাণির বাস। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাস এখনেই। এ বসভূমিতে আছে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩২০ প্রজাতির পাখি, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ, এই বনের উল্লেখযোগ্য স্তন্যপায়ী প্রাণির মধ্যে রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাম বানর, লিওপার্ড, সজারু, বন্য শুকর, চিল, ঈগল, শকুন ইত্যাদি প্রায় ২২ প্রজাতি এ বনের প্রতিনিধিত্ব করে। বনের তদারকির দায়িত্ব পালন করেন বনের সবচেয়ে বড় সদস্য কুমির ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ৪০০ প্রজাতির মাছের মধ্যে রয়েছে ২০ প্রজাতির, ৮ প্রজাতির লবস্টার, ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ৬ প্রজাতির ঝিনুক এবং ৩৬৫ প্রজাতির মৎস্যরাজ। এক কথায় সুন্দর বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাইতো কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়:

"একি অপরূপ বন, সবুজ শ্যামল সুন্দরবন,
সাগর পাড়ে, নদীর কূলে অনিন্দ্য আয়োজন"।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের জন্য সুন্দরবন নীরব দর্শকের মতো ভূমিকা পালন করছে। যার ফলে সাইক্লোনিক ঝড় যেমন-সিডর, আইলা, বুলবুল, আমফান ও ইয়াশের মতো ঘূর্ণিঝড় সরাসরি আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারেনি। সুন্দরবনের কারণে এইসব ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতি তেমন প্রবল আকার ধারণ করতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখা, জীববৈচিত্র্যের বাসস্থানসহ উপকূলীয় এলাকায় জীবিকার উৎস হিসেবে সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম।

পরিবেশবিদরা বলেছেন, সুন্দরবন আছে বলেই বাংলাদেশ এখনও টিকে আছে। নানা বাধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে সুন্দরবন। সুন্দরবন থেকে নিয়মিত আহরণ করা হয় মধু, মৌচাকের মোম, ঘর ছাওয়ার গোলপাতা, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ইত্যাদি। এই বনের কাঁচামালের ওপর গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প কারখানা। যেমন: নিউজ প্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, নৌকা, দিয়াশলাই, আসবাবপত্র সুন্দরবন থেকে আহরিত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও বনজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী,

গেওয়া, গরান, কেওড়া এবং গোলপাতা গাছ। সুন্দরবনে মানুষের অবাধ বিচরণের কারণে প্রাণি ও বনজ সম্পদ ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি এই বনে মানুষের অবাধ প্রবেশ বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে যেসব মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মতো সুন্দরবন রক্ষার প্রকল্প হাতে নিতে হবে। সুন্দরবনের ভেতর দিকে নৌ চলাচল নিষিদ্ধ করতে হবে। বনের গাছ কাটা ও পশুপাখি শিকার বন্ধ করতে হবে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে যেসব অপরাধ হয়, তা প্রতিহত করতে হবে এবং সরকারের প্রশাসনকে আরও তৎপর হতে হবে।

সুন্দরবন আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এর উপর নির্ভরশীল হয়েই আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকা অবর্তিত হচ্ছে। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে বিশ্বঐতিহ্যের ক্রমানুসারে ৫২২ তম স্থানে আসন দিয়েছে। এই বিরল সম্মান বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা, সুন্দরবন আমাদের মায়ের মত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যতই প্রবল হোক না কেন সুন্দরবন আমাদের সকল বিপদ থেকে আগলে রাখে। তাই উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যেহেতু সুন্দরবন আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে সেহেতু সুন্দরবন ও এর উপাদানসমূহ রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

ব্যর্থতার অপর নাম সফলতা

অহনা বৃষ্টি কথা
শ্রেণি: দ্বাদশ (মানবিক)
রোল: ২৩৬১১

যে ব্যক্তি জীবনের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ বলে নিজেকে মনে করে, যদি সে ভাবে তার জীবনে সফলতা আসবে না, তবে একথা একেবারেই অনর্থক। কারণ ব্যর্থতা ও সফলতা মিলিয়েই জীবন। যদি ব্যর্থতা জীবনে এসে হাতছানি দেয় তবে হতাশ হবে না। প্রথমে চিন্তা কর যে ব্যর্থ হওয়া জায়গাটিতে তোমার কী কী ভুল ছিল–ভুল গুলো সমাধান করার চেষ্টা কর। জীবনে ব্যর্থতা আসবেই। তাই বলে আশা ছেড়ে দিয়ে সফলতার কথা ভুললে চলবে না। তোমাকে তোমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের প্রত্যেকটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। যেখানে প্রত্যেকটি পরতে পরতে থাকবে একটি চ্যালেঞ্জ। তোমাকে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হবে ও এর সমাধান করতে হবে এজন্য তোমাকে প্রথমে নিজেকে আগের থেকে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। যাতে তুমি যেকোনো বাঁধার সম্মুখীন হলেও তা তুমি কাটিয়ে উঠতে পারো। তবে জীবন চলার পথে তোমার বড় শত্রু হবে আবেগ। তাই শব্দটি কখনই স্থায়ীভাবে আসতে দেবে না কারণ এটি তোমাকে পেছনের দিকে টানবে। তাই মন থেকেই বর্জন করতে শেখো আবেগ ও আবেগীয় কথার মানুষগুলোকে। শিক্ষা জীবনকে হেলা না করে সেটিকে গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াও। বিভিন্ন ধাঁধার সম্মুখীন হও। জয় করতে শেখো প্রতিবন্ধকতাকে তবেই না তুমি ব্যর্থতাকে হারাতে পারবে। জীবনের লক্ষ্যে যখন তুমি আরোহণ করবে তখন তুমি দেখবে তোমার জীবন ভরে গেছে সৌরভে আর পরিবার ও সমালোচক সমাজের বুক ভরে যাবে তোমায় নিয়ে গৌরবে। তাই ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা উত্তম। রবার্ট ব্রুসের মতন ব্যক্তি যিনি ব্যর্থ হওয়ার পরে একটি স্পাইডারের থেকে শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে স্কটল্যান্ডকে শত্রুর থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি হতাশ না হয়ে বারবার চেষ্টা করেছিলেন তাই তিনি পরবর্তীতে সফল হয়েছিলেন। তাই সফলতা কথাটির মূল ভিত্তি হলো রবার্ট ব্রুস নিজেই। পৃথিবীতে যত বড় খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা সকলেই ব্যর্থতার পরই সফলতার পরশ পেয়েছিলেন যা তাদের জীবনীতেই দ্রষ্টব্য। তাদের মতো জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। ব্যর্থতা বা দুর্বলতা সারাজীবন থাকে না। সফলতা আসবেই যদি তুমি সঠিক ভাবে পথ চলতে পারো। তবেই ব্যর্থতা হার মানবে আর সফলতা হাতের মুঠোয় ধরা দেবে।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

স্বর্ণা খানম
শ্রেণি– দ্বাদশ, রোল নং-২৩২৪২

ভূমিকা:- "Information is power" অর্থাৎ তথ্যই শক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়ক খ্যাত সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সকল উন্নত প্রযুক্তির সাথে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অবিস্মরণীয় বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর মানচিত্র এক হয়ে গেছে। ভৌগোলিক সীমারেখা যেন আজ মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতির ইন্টারনেটের পদতলে। যোগাযোগের এই উন্নত প্রযুক্তির ফলে সমগ্র বিশ্বের তথ্য ভান্ডার যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। আর তাই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

তথ্য-প্রযুক্তি কী:- তথ্য প্রযুক্তি বলতে তথ্য সংগ্রহ এবং এর ব্যবহারকেই বোঝানো হয়। একে Information Technology বা IT নামেও অভিহিত করা হয়। তথ্য-প্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত প্রযুক্তির নাম। টেলিযোগাযোগ, ভিডিয়ো, অডিয়ো, কম্পিউটার, সম্প্রচারসহ নানাবিধ প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাই আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি।

এক কথায় কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও পরিবেশনের উন্নত ও দ্রুততম মাইক্রো-ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার নাম আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি।

তথ্য-প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ:- একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিরাজমান। বাংলাদেশেও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আমাদের পৃথিবী যেন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর তাই আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো। পাশাপাশি এদেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সররকার।

এরই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তির হাইওয়ে খ্যাত সাবমেরিন

ক্যাবল লিঙ্কের সাথে। সারা দেশের উপজেলাগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক তথ্য সেবা কেন্দ্র। রাজধানীসহ দেশের জেলা শহরগুলোতে দেয়া হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির সব উপকরণ ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে চার্জ ফ্রি ইন্টারনেট সেবা, যা "ওয়াইফাই" নামে পরিচিত। দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত হয়েছে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস নেয়ার সুবিধা। ফলে প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি উন্নত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ছে দেশব্যাপী।

প্রযুক্তিবিদ্যার সীমাহীন কল্যাণে আমাদের জীবন যাত্রায় নিয়ে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ইন্টারনেট সুবিধার কারণে এখন ঘরে বসেই সম্পন্ন হচ্ছে বহু জটিল কাজ। অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলঃ- ফাইবার অপটিক ক্যাবল উদ্ভব তথ্যের আদান প্রদানের সম্ভবনাকে আরও গতিশীল করে তুলেছে। ফলে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। এই প্রযুক্তিতে আলোকরশ্মি পরিবাহী সূক্ষ্ম ফিলামেন্টের তৈরি স্বচ্ছ তারের ভেতর দিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিসরণের মাধ্যমে একই সাথে বয়ে নেয়া যায় অসংখ্য টেলিফোন কল, টেলিভিশন সংকেত ও বিপুল তথ্য সম্ভার। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তথ্য মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

ই-পার্লামেন্ট ও আধুনিক বাংলাদেশঃ- ই-পার্লামেন্ট বা ইলেকট্রনিক সুবিধা সংবলিত সংসদ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ই-পার্লামেন্ট জনগণকে উন্নতমানের সেবা দিতে পারে। তথ্য প্রযুক্তিই হতে পারে এদেশের সংসদের জন্য অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের হাতিয়ার। আর সংসদ হতে পারে মত বিনিময় ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

সম্প্রতি একটি সংস্থা পৃথিবীর ৯০টি দেশের উপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, ৭৭টি দেশ তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে অধিকতর সেবা দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান।

যাকে বলা যায় ডিজিটাল ডিভাইস। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সংসদ বাংলাদেশের জন্য খুলে দিতে পারে অপার সম্ভাবনার দ্বার। গণতন্ত্রের জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার হাতছানি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তিঃ বর্তমান পৃথিবীর অগ্রসরমানতার সাথে তথ্য প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে "রূপকল্প ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ"। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বেশ

কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে।

ইউনিকোড ভিত্তিক নতুন ফন্টঃ ২০১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রমিত বাংলা ফন্ট 'আমার বাংলা' এর প্রথম ফন্ট 'শাপলা' উদ্বোধন করা হয়েছে।

ইনোভেশন ফান্ডঃ- রাষ্ট্রীয় সেবার মান উন্নয়নে গঠন করা হয়ছে "ইনোভেশন ফান্ড"। সেবামূলক এই কর্মকাণ্ডের আওতায় রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব, প্রযুক্তি তথ্য প্রবেশাধিকার, বাংলা ভাষা সহায়ক সফটওয়্যার ইত্যাদি।

বাংলা সার্চ ইঞ্জিন পিপীলিকাঃ- ২০১৪ সালের বাংলা নববর্ষের (১৪২০) রাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হলো। পৃথিবীর প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ বাংলা সার্চ ইঞ্জিন "পিপীলিকা"। এটি পূর্ণাঙ্গ সার্চ ইঞ্জিন ২০ কোটির বেশি মানুষকে বাংলা তথ্য খোঁজায় সহায়তা করবে।

তৃতীয় প্রজন্মের নেটওয়ার্ক বা থ্রিজিঃ- থ্রিজি হলো থার্ড জেনারেশন বা তৃতীয় প্রজন্ম। ২০১৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বহুল প্রত্যাশিত থ্রিজি সেবা চালু করার লক্ষ্যে দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দিয়েছে সরকার। থ্রিজি প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় দিক হল এই প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধাসহ ভয়েস কলের পাশাপাশি ভিডিও কলও করা যায়।

জাতীয় জীবনে তথ্য প্রযুক্তি :-উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে নিবিড় সেতুবন্ধনের মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনেও দেখা দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির অনিবার্য প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিগত বহুদিক পরিমণ্ডলে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে করে দিয়েছে সহজ ও সাবলীল।

চিকিৎসাক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে প্রতিদিন নতুন করে জীবনদান করছে, রক্ষা করছে মরণব্যাধির হাত থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনার মধ্য দিয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহারের ফলে, শিক্ষার সব দরজা এখন আমাদের সামনে খোলা। তথ্য গ্রহণের অবাধ সুযোগ সারা পৃথিবীকে এক করে দিয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনাঃ- "বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইন ফরমেশন সার্ভিস" (BASIS) এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়-এবারই প্রথম আইসিটি খাতে রপ্তানি আয় ১০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০১২ সালে সফটওয়্যার ও আইসিটি খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫০ ভাগ।

এ প্রবৃদ্ধি রপ্তানিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ১০টি খাতের মধ্যে অন্যতম, ২০১২-১২ অর্থ বছরে এ খাতে রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০১.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের আইসিটি খাতে এটি যুগান্তকারী

অর্জন। প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আর এই খাতে আরও বিনিয়োগ করলে ২০২১ সাল নাগাদ এ খাতে ১০০ কোটি ডলার বার্ষিক আয় সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। যা বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত হতে পারে।

দারিদ্র বিমোচন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথ্য প্রযুক্তি:- বর্তমান বিশ্বায়নে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে আইসিটির আউটসোর্সিংয়ের জোয়ার আইসিটির নতুন ধারাকে অব্যাহত রাখতে সৃষ্টি হয়েছে নতুনতর এক অর্থনীতি যার নাম "Knowledge Economy"। নতুন ধারার এই অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজন হচ্ছে বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

এর ফলে দেশের দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ ইউরোপ বা আমেরিকার বিপরীত টাইম জোনে অবস্থান করছে। ফলশ্রুতিতে আউটসোর্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশ হতে পারে আদর্শ দেশ।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ভাল-মন্দ:- বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যেমন ভালো দিক রয়েছে তেমনি খারাপ দিকও রয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন যাত্রায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ জীবনযাত্রার মান ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে। বিজ্ঞানের এই নতুন ধারা আমাদের দূরত্বকে করে দিয়েছে সহজ অতিক্রম্য। মুহূর্তে তথ্য চলে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত।

আর এর সবই সম্ভব হচ্ছে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে। প্রযুক্তির এই সকল ভালো দিকের পাশাপাশি রয়েছে বেশকিছু মন্দ দিকও। অবাধ অথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ থাকাতে চুরি হয়ে যাচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য। অনলাইনের অবাধ-ব্যবহারের কারণে ভুল সংবাদ মুহূর্তে বিভ্রান্ত করতে পারে অসংখ্য মানুষকে। এছাড়া নিষেধাজ্ঞা না থাকাতে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরাও শিকার হচ্ছে অনলাইন ডায়োলেশনের।

হ্যাকিং বা অনলাইন চুরির কারণে সর্বশান্ত হচ্ছে বহু মানুষ। তাছাড়াও ব্ল্যাকমেইল করে অনলাইনে হুমকি দিয়েও এক ধরণের নব্য সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। অনেক খারাপ দিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের উচিত হবে ভালো দিকগুলো গ্রহণ করা। আর কেবল তখনই আমাদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হবে।

উপসংহার:- সম্ভাবনার উজ্জ্বল দুয়ারে দাঁড়ানো একটি দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এদেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির নির্ভর দেশ গঠনের কোনো বিকল্প নেই। আর তাই আমাদের আরও বেশি তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর হতে হবে এবং এই খাতকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রবাহমান সময় এবং সংগ্রামী জীবন একসূত্রে গাঁথা

মরিয়ম মমতাজ বিনতে আনোয়ার
দ্বাদশ শ্রেণি, রোল: ২৩৫৯৫

সময়ের শ্রোতে বাঁধা এই জীবন চলমান, সময় যেমন বিরামহীন ভাবে বয়ে চলে এ জীবনও তেমন ভাবেই সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে থাকে। আর এই সময়কে কাজে লাগিয়ে মানুষকে সাফল্য অর্জন করতে হয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, "Time and tide wait for none"–'সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।' আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করি এবং এক সময় মৃত্যুবরণ করি। এই সীমিত সময়কালের মধ্যে কেউ হয় স্মরণীয় আবার অনেকে রয়ে যায় অজানা কোনো এক শহরের ছোট্ট এক কুঠুরিতে। আমাদের জীবনের সব থেকে মূল্যবান জিনিসটি হচ্ছে সময়। যেটি একবার ক্ষেপণ করলে পরে শত আফসোস করলেও তা আর ফিরে আসে না। আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করি চলমান সময়ের সাথে লড়াই করে নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করার। এই লড়াইয়ে কিন্তু মানুষ হেরে যায় আবার কিছু মানুষ ধৈর্য ধারণ করে তার লক্ষ্যে অটল থাকে। জীবনটা অনেক কঠিন। টিকে থাকতে হলে সময়ের সাথে সে যেকোনো পরিবেশই হোক না কেন সবাইকে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রম এবং দৃঢ় মানসিকতার সাথে সমানে এগোতে হবে। যেমন ডাইনোসর এর কথা চিন্তা করি, ধারনা করা হয় এই বিশাল দেহধারী প্রাণী বহু যুগ আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর পরিবেশের ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বহু প্রাণী এ নতুন পরিবেশের সাথে তাদের খাপখাইয়ে নিতে পারেনি। যার ফলে তারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পৃথিবীর বুকে এখনো টিকে আছে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবেশকে করে তুলেছে উন্নত। ১০০০ বছর আগে পৃথিবী যে অবস্থানে ছিলো আজ সে কথা কল্পনাও করা যায় না। মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দেশ, সমাজ, জাতি, গোষ্ঠীকে দিন দিন এক নতুন পরিবেশ উপহার দিচ্ছে। আজ পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর 'সংকল্প' কবিতার সেই লাইনটি উল্লেখ করা যায়, "বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।" কবির লেখা আজ সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে শুধু মাত্র মানুষের অসীম চেষ্টায়। মানুষ তার এই স্বল্প সময়কালীন চলমান জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীতে এনেছে বাসোপযোগী সুন্দর পরিবেশ এবং নিজেকে করে তুলেছে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়। তাই মানুষ তার কর্মের জন্য আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব।

প্রাণের ডাক

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

জন্ম মাটি ডাকছে আমায়
ফিরে আয় মাটির গাঁয়ে,
ইট পাথরের শিকল খুলে
মুক্তি নিতে পল্লী মায়ে।
আবার ফিরে আয় তো দেখি
কাস্তে হাতে মাঠে যাবি,
কাটবি ফসল ভরবি গোলা
পান্তা খেয়ে দিন কাটাবি!
শহর-সুখের অসুখ বিসুখ
পালিয়ে যাবে গায়ের ঘামে,
স্নেহ সুধার ধুলা মেখে
থাকবি হেথা সবুজ খামে!
ঘুমিয়ে যাবি আগের মত
মাটির পরে বিছান মেলে,
বর্ষা হলে নামবি মাঠে
ফিরবি শেষে হেসে খেলে।
গল্প দাদুর আসর হবে
এখন না হয় দাদুই হবি!
গল্পে মাতিস আগের মত
নাতি নাতনির কাছেই রবি।
জন্ম মাটি ডাক দিয়ে কয়
আর থাকিস না জড় হয়ে,
বিকেল হলে দক্ষিণ হাওয়া
শির শিরিয়ে যাবে বয়ে।
গ্রামে তোর শিকড় আছে
নদীর সাথে বলবি কথা,
মনের যত জমাট ধুলো
বর্ষা এসে মুছবে ব্যাথা।
গ্লানি যত আছে জমা
গাছের পাতায় নেড়ে দিবি,
নতুন করে বুকের কোণে
স্বপ্ন ঘুড়ি আঁকা ছবি।
মনের কোণে বাজলে বাঁশি
চোক্ষু দুটি আসবে বুজে!
পুরানো দিনের হারা হাসি
এমনি করেই পাবি খুঁজে!

ধ্যানবান মানুষ

আ.ই.শ.ম. বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ভাবনায় গড়া মানুষ আমরা
ভেবে ভেবে হই সারা
কত যে ভেবেছি কত কি'যে চেয়েছি
তবুও তা পেয়েছি কি?
কল্পনায় আমরা সাজাই যত–
কল্পনাতেই তার শেষ।
মানুষের মাঝে পাওয়া যায় না কি
তবুও আশা শতবার।
আশা কি আমাদের পূর্ণ হবে না
যাবে কি বিলীন হয়ে?
যাবে কি জীবন গড়িয়ে,
রিক্তের বেদনা বয়ে?
নিমেষের পাখিটি শুধালো আমায়
ধ্যান মনে শুন তবে
আল্লাহকে যাদি পাও
সকল বাসনা পূর্ণ হবে।

মাতৃবন্দনা

সুদেব মুখার্জী
দ্বাদশ শ্রেণি, রোল-২৩৫৬৬

কোনো কাব্যের শক্তি নাই বন্দিতে মাতৃমহিমা
কোনো কবির নাই সামর্থ্য খণ্ডিতে মাতৃগরিমা
মায়ের মতো আপন কেহ, বিশ্বমাঝারে নাই
সারা দুনিয়ার কোনোখানে তুমি,
খুঁজে পাবে না কো ভাই!
মায়ের মতো পাবে না হেন,
কল্যাণকামী বন্ধু
খোঁজো তুমি গিয়া আকাশ,
পাতাল, পর্বত, জল, সিন্ধু।
সারা দুনিয়ার বন্ধু স্বজন,
হতে পারে তব অরি,
শুভাকাঙ্ক্ষী যত প্রিয়জন,
যেতে পারে দূরে সরি।
কিন্তু মা শুধু থাকে যে পাশে
এমনটি আর নাই,
চরম দূর্ভাগা সে জন,
যার পাশে মাতা নাই।
বিশ্বমাঝারে স্মরণীয় আর বরণীয় জন যারা
হয়েছে বড় শুধুমাত্র মাতৃআশিষে তারা।
ন'মাস ধরে যার রক্ত পানে
গঠিত হয়েছে দেহ
কোথায় পাবো এমন দেবতা
আমার মায়ের মতো?
বড় করে তুলিল তোমায়
কঠোর কঠিন শ্রমে,
আজ কেন হায় সেই 'মা' কে
পাঠাও বৃদ্ধাশ্রমে।
তোমায় আমি জানাই ধিক্কার
হে নরাধম পাষণ্ড
মা'কে ত্যাজিয়া সাজিস ধার্মিক
আসলে তুই ভণ্ড।
মা যেন আদ্যাশক্তি সাক্ষাৎ মহামায়া
ছদ্মবেশে ধরে আছে মানবীর কোনো কায়া।
মায়ের চরণতলে রক্তকমল ফোঁটে
তার কপালের সিঁদুরে যেন, নতুন সূর্য ওঠে।
আমার মায়ের আঁচল ছায়ায়
স্নেহের আসন পাতা।
সারাবিশ্বের মাতৃচরণ তলে,
নোয়াই আমার মাথা।

বিদ্রোহী নজরুল

সুমাইয়া আফরিন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৩৬৭৮

বিদ্রোহী কবি নজরুল
বিপ্লবী কবি তুমি।
সাম্যের কবি নজরুল,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া,
সেই ছেলেটি তুমি,
১১ জ্যৈষ্ঠ জন্ম নিলে চুরুলিয়া গ্রামে,
ডাকত সবাই ওভাই দুখু মিয়া নামে,
পৃথিবীর বুকে এলে তুমি বিদ্রোহী
কত কাব্য লিখেছো আমাদের জন্য
কত গ্রন্থ লিখেছো তুমি.
গেছো তুমি চলে,
পৃথিবীকে আলোকিত করে,
আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে।
শ্রমিকের মুজুরির জন্য
বিদ্রোহ করেছ তুমি
তুমিই কবি, তুমিই নজরুল।
গাই তোমারই গান
আমরা সবাই শ্রদ্ধাভরে স্মরি তোমার দান।

আমার মাতৃভূমি

অহনা বৃষ্টি কথা
শ্রেণি: দ্বাদশ (মানবিক), রোল: ২৩৬১১

আমার মাতৃভূমি কত না সুন্দর তুমি
সোনার চেয়ে দামি সে যে আমার মাতৃভূমি
তুমি হলে অগ্রহায়ণে চাষির মুখের হাসি
তোমারই মাঝে লুকিয়ে আছে মায়া
যে মায়ায় আছে মাতৃস্নেহের ছায়া।
তুমিতো সেই বিলের ঝিলের লাল শাপলার রাশি
ওগো প্রিয় মাতৃভূমি আমি তোমায় ভালোবাসি।
তোমায় নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে, আঁকতে চাই ছবি
তুমিতো সেই শীতের শিশির ভেজা
ভোরের স্নিগ্ধ আলোক রবি
তোমার প্রেমে পড়েছে হাজারও কবি।
আমি এড়াতে পারি না তোমার রূপের ঝলক
তাই তোমায় দেখে পড়ে না চোখের পলক।
তুমি যে ওগো আমার মাতৃভূমি
তুমি আমার মায়েরই সমান দামি।

বিজয়ের দিন

অচেনা পাড়
দ্বাদশ শ্রেণি, রোল : ২৩৫৫৯

বাংলাদেশের পাক-শাসনের
আসন যেদিন টলে,
সেদিনটাকে আজকে সবাই
'বিজয় দিবস' বলে।
বিজয় কিন্তু অনেক দামী;
সহজলভ্য নয়!
মুক্তিসেনা বিজয় আনে
জয় করে সব ভয়।
লাল সবুজের পতাকাটার
আজকে খুঁটি শক্ত;
আনতে সেটা, বীর সেনারা
দিয়েছিলো কতো রক্ত।
বাংলা মায়ের বীর ছেলেরা
ভয় পায় না মোটে।
তাদের ত্যাগে মোদের মুখে
বিজয়ের স্লোগান ফোটে।
বিজয় দিবস রক্তে ধোঁয়া
বীর শহীদের স্মৃতি,
বিজয় নিয়েই আজকে
লেখা-কবিতা আর গীতি।
বিজয় মাখা ফুলে-পাতায়
বিজয় সবুজ ঘাসে,
বছর ঘুরে এদিন যেন
বারে বারে আসে।

এসো মোংলার কথা বলি

খাদিজা আক্তার পিকু
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৩৫১৮

আমি গর্বিত আমি আনন্দিত,
আমার মোংলা জন্মভূমি।
কতো ঐতিহ্য এই মোংলাতে
তা কি জানো তুমি?
মেছেরশাহ পীরের মাজার শরীফ
চাঁদপাই গ্রামের স্মৃতি।
কতোকাল পূর্বে হয়েছে উনার,
জীবন সংগ্রামের ইতি।
রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ ছিল,
রুদ্র নামের কবি,
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লেখার গান
মিঠাখালীর সেই প্রতিচ্ছবি।
দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মোংলাকে
যেতে পারি কি ভুলে?
মোংলা বন্দর ব্যাবসার জন্য
সৌরভের ফুলে ফলে।
জয়মনির সাইলোর কথা,
কার না আছে জানা?
পর্যটকরেরা প্রতিদিন সেখানে
দর্শনের জন্য, হাজার দেয় হানা।
সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ,
জীববৈচিত্র্য নিয়ে, বৃক্ষের সমাহার।
করমজলের পর্যটনকেন্দ্রে গেলে,
মন জুড়াবে না কার?
গ্রাম বাংলার সেই লাঠি খেলা,
মোংলাতে এখনও দেখি।
অসংখ্য স্মৃতি ধরে রেখেছে মোংলা,
তাই তো ছন্দে লিখি।
হাজার হাজার নারী-পুরুষ মিলে,
ইপিজেডে এ করে কাজ।
সকালে বিকালে দেখলেই বুঝি,
নদী পারাপারের ভিন্ন সাজ।
বিদেশি জাহাজ, কার্গো, লঞ্চ,
জালি বোটের সমাহার।
আমাদের মোংলায় ঘুরতে আমন্ত্রণ,
খোলা রইল সবার দ্বার।
অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার আবাসভূমি,
একাত্তরের কতো যে স্মৃতি।
মোংলার সাংস্কৃতি ঐতিহ্য অনেক
হয়েও হয় না ইতি।

কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ

অধ্যাপক কে এম রব্বানী
অধ্যক্ষ

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক
সমাজকর্ম

ড. অসিত কুমার বসু
প্রভাষক
সংস্কৃত

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক
সংস্কৃত

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক
দর্শন

আবু ইব্রাহীম মাহ মোঃ বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিশ্বজিৎ মণ্ডল
প্রভাষক
গণিত

মনোজ কান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক
বাংলা

এস.এম. মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
ইংরেজি

মমতাজ খানম
প্রভাষক
ইংরেজি

প্রমীলা রায়
প্রভাষক
ইতিহাস

সাহারা বেগম
প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা

পাপিয়া হালদার
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোসাঃ নিলুফা খাতুন
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস

রঞ্জিতা মণ্ডল
প্রভাষক
সমাজকর্ম

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক
ভূগোল

রূপা দাস
প্রভাষক
বাংলা

নিগার সুলতানা সুমী
প্রভাষক
মার্কেটিং

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পলাশ চক্রবর্তী
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আরিফুজ্জামান
প্রভাষক
অর্থনীতি

খাদিজা খাতুন
প্রভাষক
ইসলাম শিক্ষা

মোঃ ইব্রাহিম খলিল
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস

নাজমুল হক
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

নাদিম মোহাম্মদ ফয়সাল
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ সাইদুজ্জামান মিন্টু
বিজ্ঞান প্রদর্শক
রসায়ন

শেফালী মণ্ডল
বিজ্ঞান প্রদর্শক
জীববিজ্ঞান

কলেজের কর্মচারীবৃন্দ

সুকুমার বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ আজিজুল খান
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

গণেশ কুমার সাহা
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

বাসুদেব বিশ্বাস
অফিস সহায়ক

অজিৎ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

রমেশ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

মোঃ সাইফুল ইসলাম মোল্লা
অফিস সহায়ক

বিথিকা মিস্ত্রী
আয়া

কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র

কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাগরিক সভা

মোংলা কলেজের প্রথম ক্লাসের পর তোলা ছবি।

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ফাদার মারিনো রিগন ও কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

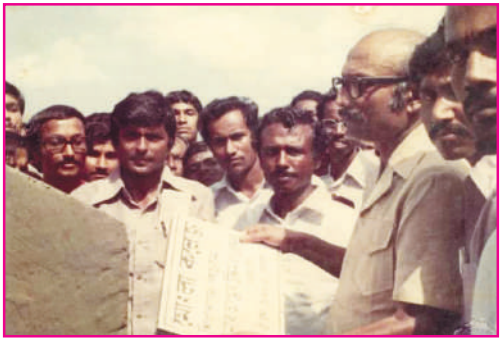

কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সংসদ সদস্য আফতাব উদ্দীন আহমেদ

অমর একুশের প্রভাতফেরির পরে কলেজ শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ফাদার মারিনো রিগন ও অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে

কলেজে কলা ভবনের ফলক স্থাপন করেন ফাদার মারিনো রিগন

কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পৌর চেয়ারম্যান আব্দুল বাতেন

কলেজের প্রথম ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পৌর চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আব্দুল বাতেন

কলেজের বিজ্ঞান ও কলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মীর শাহাবুদ্দিন মাহমুদ

কলেজের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৪ উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী-এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন

শিক্ষক পরিবারের হাড়বাড়িয়া ভ্রমণ-২০২৪

২৫শে মার্চ ২০০৪ গণহত্যা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী।

দামেরখণ্ড স্মৃতিসৌধ ৭১ এর গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী-এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণানুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একাংশ (২০২৪)

মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সহযোগিতায় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানে মোংলা সরকারি কলেজ মাঠে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ (২০২৪)

ফাদার মারিনো রিগন এর শততম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহণ। (২০২৪)

একুশের প্রভাতফেরি শেষে কলেজ শহিদ মিনারে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী-এর নেতৃত্বে মোংলা সরকারি কলেজ পরিবারের শ্রদ্ধা নিবেদন (২০২৪)

একুশের প্রথম প্রহরে (২০২৪) মোংলার কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী-এর নেতৃত্বে মোংলা সরকারি কলেজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

কলেজের ফুটবল দলের সাথে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী

মোংলা সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করায় প্রফেসর কে এম রব্বানী স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বর্ষবরণ ১৪৩১ উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানী স্যারের নেতৃত্বে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

মোংলা সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনায় স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাশ পর্যবেক্ষণ (২০২৪)

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত ঃ ১৯৮১